STUDY MATERIALS

UG/SEMESTER : 4

DSC/GE-4 , CODE : BNGGCOR04T

UNIT : 3 (রাজকাহিনী – অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রাজকাহিনী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। টডের রাজপুত কাহিনি অবলম্বনে মধ্যযুগীয় রাজপুত রাজাদের বীরত্ব, ত্যাগ ও মহিমার এমন রূপনির্মাণ শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন আন্তর্জাতিক সাহিত্যেও দুর্লভ। রাজপুত চিত্রকলার সঙ্গে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় উনিশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে। যখন তিনি কচ ও দেবযানী, রাধাকৃষ্ণের ছবি বা মোগল চিত্রাবলী আঁকছিলেন, তখনই *রাজকাহিনীর* রচনা। টডের ইতিহাস অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা হলেও সে আকরকে ব্যবহার করে তিনি সৃজন করেছেন শব্দ-ছবির এমন এক ভিন্ন রূপ জগৎ, শৌর্য, বীর্য, আত্মোৎসর্গ এবং দেশপ্রেমের মহিমায় যা প্রোজ্জ্বল। অবনীন্দ্রনাথের সংগীতময় অসামান্য স্পন্দিত গদ্য *রাজকাহিনীর* কাহিনিগুলিকে দান করেছে এক অনন্য বিশিষ্টতা। কল্পনায় তিনি পূরণ করেছেন বাস্তবের সংগত অনেক দাবি। ভাষার ঐশ্বর্য সেই কল্পনালীলার সঙ্গে মিলিয়েছেন তাল। সর্বোপরি, পাঠকের অখণ্ড মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়ক হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় রচনাকৌশল যা একইসঙ্গে কুশলী ও চিত্তগ্রাহী। সবমিলিয়ে, *রাজকাহিনী* আজও বাঙালি পাঠকের কাছে সেরা কিশোর ক্লাসিক।

রাজ কাহিনী
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজকাহিনী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.dlobl.org

www.boierhut.com/group

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬৩

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

শিলাদিত্য

শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে সময়ে বল্লভীপুরে রাজা কনক সেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্যকুণ্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্রকন্যা কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশ সূর্যদেব যেমন একা, তেমনি আকাশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্যকুণ্ডের তীরে আদিত্য-মন্দিরে সূর্য-পুরোহিত তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়োই একাকী, বড়োই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয় অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর—ভৃত্য নেই, অনুচর নেই, একটি শিষ্যও নেই! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্যদেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষস রাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন। আর মনে-মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই, তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত বার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের বুকপাটাখানার মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহুকষ্টে বন্ধ করেছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলো—পরনে ছিন্নবাস, কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী! বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্যমন্দিরে আশ্রয় চায়! ব্রাহ্মণ দেখলেন কন্যাটি সুলক্ষণা, অথচ তার বিধবার বেশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—‘কে তুমি? কী চাও?’ তখন সেই

ব্রাহ্মণ-বালিকা কমলকলির মতো ছোটো দুইখানি হাত জোড় করে বললে—‘প্রভু, আমি আশ্রয় চাই; ব্রাহ্মণ-কন্যা, গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা; বিয়ের রাতে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগী বলে সকলে মিলে আমায় আমাদের দেশের বার করেছে। প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মা-ও নেই, আমায় আশ্রয় দাও।’ ব্রাহ্মণ বললেন—‘আরে অনাথিনী, এখানে কোন সুখের আশায় আশ্রয় চাস? আমার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আমি যে নিতান্ত দরিদ্র, বন্ধুহীন।’

ব্রাহ্মণ মনে-মনে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলতে লাগল—‘হে দরিদ্র, হে বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু কর, আশ্রয় দাও।’ ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন আশ্রয় দিই; আবার ভাবলেন—‘যে মন্দিরে আশি বৎসর ধরে একা এই সূর্যদেবের পূজা করলাম, আজ শেষ-দশায় আবার কার হাতে তাঁর পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান আদিত্যদের যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন— এই আমার সেবাদাসী! হে আমার প্রিয় ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ জোড়হস্তে সূর্যদেবকে প্রণাম করে, দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা সুভাগাকে সূর্যমন্দিরে আশ্রয় দিলেন।

তারপরে কতদিন কেটে গেল, সুভাগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাজই শিখেছেন, কেবল ননীর মতো কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পারলেন না বলে আরতির কাজটা বৃদ্ধকেই করতে

হত। একদিন সুভাগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে— আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়েছে। সেই দিন সুভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে একসের ওজনের একটি ছোট প্রদীপ নিয়ে এসে বললেন—'পিতা, আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি করুন। ব্রাহ্মণ একটু হেসে বললেন— 'সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই। নতুন প্রদীপ তুলে রাখ, কাল নতুন দিনে নতুন প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি হবে।' সেইদিন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণ সুভাগাকে সূর্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন—যে-মন্ত্রের গুণে সূর্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে-মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে আরতিশেষে নিভন্ত প্রদীপের মতো ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ ধীরে-ধীরে নিভে গেল—সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন। সুভাগা একলা পড়লেন।

প্রথম দিনকতক সুভাগা বৃদ্ধের জন্য কেঁদে কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতকদিন মন্দিরের পাথরের দেওয়াল মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে তার গায়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, হাতি, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে সুভাগার হাতে আর কোনো কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে, ফুলের মালঞ্চে একা-একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নতুন বাগানে দুটি-একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি-একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে দু-একটি ছোট পাখি, গুটিকতক

রঙিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোটো-বড়ো ছেলে-মেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখি শুধু দু-একটা পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র; কিন্তু সেই ছেলের পাল, ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না, হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় পরে ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে দেখতে সুভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল— চারিদিকে কালো মেঘের ঘটা বিদ্যুতের ছটা, আর গুরুগুরু গর্জন— সেই সময় একদিন ক্ষুরের মতো পুবের হাওয়া সুভাগার নতুন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্যপ্রায় করে শনশন শব্দে চলে গেল। পাখির ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপড়ির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল। সুভাগা তখন সেই ধারা শ্রাবণে একা বসে-বসে বাপমায়ের কথা, শ্বশুর-শাশুড়ির নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রে সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলেন। আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন— 'হায় এই নির্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারাজীবন একা কাটাব।' হরিণের চোখের মতো সুভাগার কালো-কালো দুটি বড়ো-বড়ো চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল। তিনি পুবে দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তরে, দক্ষিণে—চারিদিকে অন্ধকার; মনে পড়ল, এমনি অন্ধকারে একদিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও সেদিনের মতো অন্ধকার—সেই বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির— কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দিনে অনাথিনী অভাগিনী সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সুভাগার কালো চোখ

থেকে দুটি ফোঁটা জল দুটি বিন্দু বৃষ্টির মতো অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন। তারপর কী জানি কী মনে করে, সুভাগা সেই সূর্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝনঝনা, মেঘের কড়মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল! সুভাগার মনে আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ নেই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সুর্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে-ধীরে, ভয়ে-ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল। তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেওয়াল, লোহার দরজা যেন আগুনে-আগুনে গলিয়ে দিয়ে সাতটা সবুজ ঘোড়ার-পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভাগা দুহাতে মুখ ঢেকে বললেন—'হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায়!' সূর্যদেব বললেন—'ভয় নেই, ভয় নেই। বৎসে, বর প্রার্থনা কর!' বলতে-বলতে সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল। তখন সুভাগা বললেন— 'প্রভু, আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমার আর না থাকতে হয়। সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক!' সূর্যদেব বললেন—'বৎসে, দেবতার বরে মৃত্যু হয় না দেবতার অভিশাপে

প্রভু যদি বর দিলে, তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি। ছেলেটি তোমারি মতো তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কণার মতো সুন্দরী।’

সূর্যদেব তথাস্তু বলে অন্তর্ধান করলেন। ধীরে-ধীরে সুভাগার চোখে ঘুম এল, সুভাগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সুভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন তার সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোটো পাখি কী সুন্দর গান ধরেছে। ক্রমে সকাল বেলার একটুখানি সোনার আলো সুভাগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কচি দুটি ছেলেমেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্যদেবের বর সফল হল—সুভাগা দেবতার মতো সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল লোকের চোখের আড়ালে নির্জন মন্দিরে জন্ম হল বলে, সুভাগা দুজনের নাম দিলেন, গায়েব গায়েবী।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলেন; তখন পুবে সূর্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন। সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে সূর্যের আলো ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে-ধীরে নিভে গেল। তিনি মনে-মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না।

গায়েব ক্রমশ যখন বড়ো হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় গায়েবী মায়ের কাছে বসে মন্দিরের কাজকর্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দান্ত, গায়েবী তেমনি শিষ্ট শান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোটোখাটো মেয়ে সেধে-সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল

ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে— গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায়, পড়ায়, গায়ের জোরে সকল বিষয়ে বড়ো; এস আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি আর আমরা তার প্রজা হই; তাহলে গায়েব আর আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই বলে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা বলে কাঁধে করে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব হাসিখুশিতে সেই সকল ছোটো-ছোটো ছেলের কাঁধে বসে আছেন, এমন সময়ে একটি খুব ছোটো ছেলে বলে উঠল— 'আমি রাজার পূজারী। মন্ত্র পড়ে গায়েবকে রাজটীকা দেব।' তখন সেই ছেলের পাল গায়েবকে একটা মাটির টিবির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মতো সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময়, সেই ছোটো ছেলেটি তাঁর কপালে তিলক টেনে দিয়ে বললে—'গায়েব, তোমার নাম জানি, বল তোমার মায়ের নাম কী? বাপের নাম কী?' গায়েব বললেন—'আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী—মায়ের নাম সুভাগা। আমার বাপের নাম—কী?' গায়েব জানেন না যে তিনি সূর্যদেবের বরপুত্র। নাম বলতে পারলেন না, লাজ্জায় অধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো-হো করে হাততালি দিতে লাগল, লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ করে চড়-চাপড়ে ছোটো ছেলেদের ফোলাগাল বেশি করে ফুলিয়ে, রাগে কাঁপতে-কাঁপতে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। সুভাগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোট প্রদীপ দিয়ে কেমন করে সূর্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন; এমন সময় ঝড়ের মতো গায়েব এসে পিতলের প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলেন। নিরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের দেয়ালে লেগে ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল, সেইসঙ্গে সূর্যদেবের

মূর্তি-আঁকা একখানা কালো পাথর সেই দেয়াল থেকে খসে পড়ল। সুভাগা বললেন— 'আরে উন্মাদ, কী করলি? সূর্যদেবের মঙ্গল-আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি?' গায়েব বললেন—'দেবতাও বুঝিনে, সূর্যও বুঝিনে' বল, আমি কার ছেলে? না হলে আজ তোমার সূর্যমূর্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব।' যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্যমূর্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না। তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভাগার মনে হলো—কী জানি কী করে! তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধরে বসলেন—'বাছা শান্ত হ, স্থির হ, আর সূর্যদেবের অপমান করিস্ নে; পিতার নামে কী কাজ? আমি তোর মা আছি, গায়েবী তোর বোন, আর তোর কিসের অভাব? গায়েব তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র পথের ধুলো, ভিখারীর অধম?' কথাগুলো তীরের মতো সুভাগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন; মনে মনে ভাবলেন—হায় ভগবান, কী করলে? এ দুরন্ত ছেলেকে কেমন করে বোঝাই, কী বলে প্রবোধ দিই? গায়েব গায়েবী নিচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্যের সন্তান, সকলের চেয়ে পবিত্র, এ কথায় কে বিশ্বাস করবে? সুভাগার সূর্যমন্ত্রের কথা একবার স্মরণ হল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে নিশ্চয় মৃত্যু—এই কচি বয়সে গায়েব গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে—তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সুভাগা বললেন—'বাছা কথা রাখ, ক্ষান্ত দে, চল্ আমরা অন্য দেশে চলে যাই, সূর্যদেবকেই তোদের পিতা বলে জেনে রাখ।' গায়েব ঘাড় নাড়লেন, বিশ্বাস হয় না। তখন সুভাগা বললেন—'তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর, এখনি তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায়, আমাকে আর ফিরে পাবি না।' সুভাগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল। গায়েবী

বললে—‘ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও?’ গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। সুভাগা দুজনের হাত ধরে সূর্যমূর্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। এই মন্দিরে একাকিনী সুভাগা একদিন মৃত্যু ইচ্ছা করে যে মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মতো সেই সূর্যমন্ত্র আজ উচ্চারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কতই ব্যথা! সূর্যদেব দর্শন দিলেন— সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সুভাগা বললেন—‘প্রভু গায়েব গায়েবী কার সন্তান?’ সূর্যদেব একটিও কথা কইলেন না। দেখতে-দেখতে সূর্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিনী সুভাগার সুন্দর শরীর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গায়েবী কেঁদে উঠল—‘মা, মা!’ গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—‘মা কোথায়?’ সূর্যদেব কোনোই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর সেই রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন! গায়েব বুঝলেন মা আর নেই। রাগে দুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল। গায়েব মন্দিরের কোণ থেকে সূর্যমূর্তি-আঁকা পাথরখানা কুড়িয়ে সূর্যদেবকে ছুড়ে মারলেন। যমরাজের মহিষের মাথাটার মতো সেই কালো পাথর সূর্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত কয়লার মতো একদিকে ঠিকরে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে গায়েব মূর্ছিত হলেন।

অনেকক্ষণ পরে গায়েব যখন জেগে উঠলেন, তখন সূর্যদেব অন্তর্ধান করেছেন, মাথার কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে। গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন— ‘সূর্যদেব কোথায়?’ গায়েবী তখন সেই কালো পাথরখানা দেখিয়ে বলল—‘ওই নাও ভাই আদিত্যশীলা। এই পাথর তুমি যার উপর ফেলবে তার নিশ্চয় মৃত্যু। সূর্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন, আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য। তোমার বংশ সূর্যবংশ নাম দিয়ে পৃথিবী শাসন

করবে, আর তুমি মনে-মনে ডাকলেই ওই সূর্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে

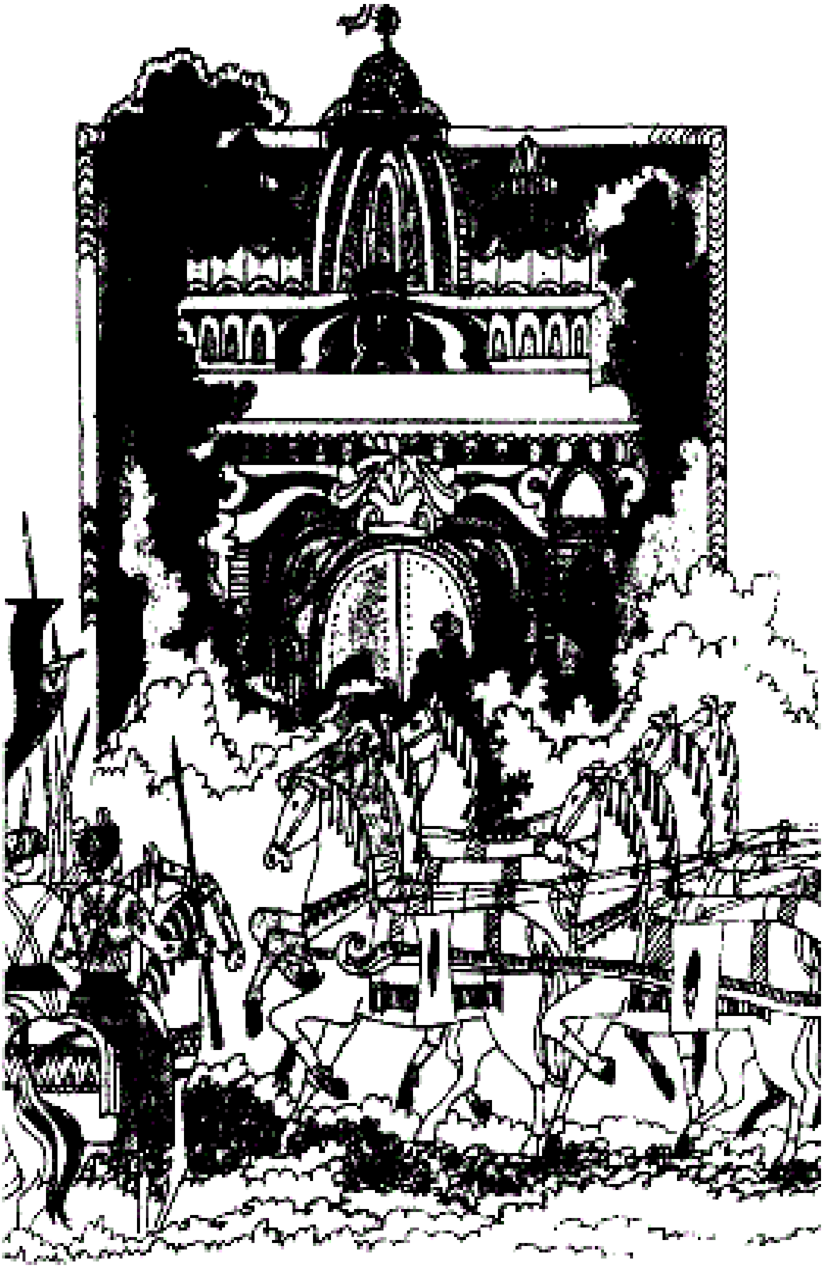

সূর্যের রথ তোমার জন্য উঠে আসবে! রথের নাম সপ্তাশ্বরথ। যাও ভাই, সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা-হাতে পৃথিবী জয় করে এস।' গায়েব বললেন— 'তোকে কোথা রেখে যাব বোন?' গায়েবী বললে—'ভাই, আমাকে এই মন্দিরে রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব। তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমায় এই মন্দির থেকে রাজবাড়িতে নিয়ে যেও।'

গায়েব মহা আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে বন্ধ রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন। আর গায়েবী সেই রাশীকৃত ছাই সূর্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে 'মারে! ভাইরে!' বলে পাষাণের উপর আছাড়া খেয়ে পড়ল।

সেদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেই সময় হঠাৎ সূর্যমন্দির ঝনঝন শব্দে একবার কেঁপে উঠল। তারপর আশি মন কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্যমূর্তিকে নিয়ে আর ননীর পুতুলের মতো সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নিচে চলে যেতে লাগল। গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। বৃথা চেষ্টা। গায়েবী দেয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা করলে, পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না—কাচের সমান। তখন গায়েবী 'ভাইরে!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার।

কতদিন চলে গেছে, গাযেব সেই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে দেশ-বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে, শেষে বল্লভীপুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখযুদ্ধে সংহার করে শিলাদিত্য নাম নিয়ে, রাজসিংহাসনে বসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী কাউকে বা সেনাপতি করে, যত নিষ্কর্মা বুড়ো কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে

করে, শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোনো দিকে সাড়া শব্দ নেই পায়ের ধারে চামরধারিণী চামর-হাতে ঢুলে

পড়েছে, শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ-নিভ হয়েছে, সেই সময় শিলাদিত্য তাঁর ছোটো বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর মনে হলো যেন অনেক, অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে; আর সেই সূর্যমন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে— 'ভাইরে, ভাইরে, ভাইরে!'

শিলাদিত্য চিৎকার করে জেগে উঠলেন। তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন ভীমের বর্ম-দুখানার মতো মন্দিরের দুখানা কপাট একেবারে বন্ধ—কতকালের লতাপাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতাপাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেললেন—দিনের আলো পেয়ে একঝাঁক বাদুড় ঝটাপট করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্যদেবের মূর্তি ছিল সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার কালো পর্দার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে। শিলাদিত্য ডাকলেন—'গায়েবী! গায়েবী! কোথায় গায়েবী? অন্ধকার তেকে উত্তর এল—'হায় গায়েবী! কোথা গায়েবী!' শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন— উত্তর দিকটা শূন্য করে সূর্যমূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে; কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ডু বাসুকির ফণার মতো মাটির উপর জেগে আছে। যে-ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে-ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাইবোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে-শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি প্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—'গায়েবী! গায়েবী!' তাঁর সেই করুণ সুর, সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে ফিরে ক্রমে দূর থেকে দূরে পাতালের মুখে চলে গেল। গায়েব নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন।

সেইদিন রাজ-আজ্ঞায় রাজ-কর্মকারেরা পুরু সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে-মন্দিরের আর

অন্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল, তেমনি রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেতপাথর আনিয়ে সূর্যকুণ্ডের চারিদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন। যখনি কোনো যুদ্ধ উপস্থিত হয়, শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন; তখনি তাঁর জন্য সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাসঘাতকমন্ত্রী যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন, সবচেয়ে ভালোবাসতেন, সে-ই তাঁর সর্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে কেউ জানত না যে, শিলাদিত্যের জন্য সূর্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বরথ উঠে আসে।

সিন্ধু পারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, গো-রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না; শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বার-বার ডাকলেন, কিন্তু হায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনি রইল। শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজ-রথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্যদেবের সঙ্গে-সঙ্গে সূর্যের বরপত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছারখান করে চলে গেল।

গোহ

প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায়-ঢাকা ছোটোখাটো পাখির বাসাটি যেমন, গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতীর শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনি সুন্দর, তেমনি মনোরম ছিল। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত বীরকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রানী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড়ো ইচ্ছা ছিল যে, যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেতপাথরের প্রাসাদে রানী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রানীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়, বিধাতা সে-সাধে বাদ সাধলেন, বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল— শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজ-অন্তঃপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে, পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে, বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে, যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেওয়ালের মতো সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপড়ে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোটো শ্বেতপাথরের বারাণ্ডা বসিয়েছিলেন। সেইখানে বসে, রাস্তার দিকে চেয়ে, তিনি প্রতিদিন একখানি রুপোর চাদরে সোনার সুতোয়, সবুজ রেশমে, সবুজ ঘোড়ায়-চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে-মনে ভাবতেন—

মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখির পালকের মতো হালকা এই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব; তারপর দুজনে মিলে পঁচিশ গজ ভাঙনের গায়ে—পাতলা একখানি মেঘের মতো শাদা শ্বেতপাথরের সেই বারাণ্ডায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব।

মাঝে-মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন সেই বল্লভীপুরের রাস্তার বহুদূরে একটি বল্লমের মাথা ঝকমক করে উঠত; তারপর কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারাণ্ডায় রাজরানী পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীরবেগে চন্দ্রাবতীর সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত।

যেদিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত, পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারাণ্ডায় মহারাজার সেই চিঠি হাতে বসে থাকতেন।

সেই আনন্দের দিন যখন কোনো বুড়ো জাঠ গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে-যেতে, কোনো রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে ছাগল চরাতে চরাতে, চন্দ্রাবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত, তখন পুষ্পবতী কারো হাতে এক ছড়া পান্নার চিক, কারো হাতে-বা একগাছা সোনার মল ফেলে দিতেন।

রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার-হাজার আশীর্বাদ করতে-করতে সেই সকল রাজভক্ত প্রজা সকালবেলায় কাজে যেত; সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম-হাতে মহারানী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত।

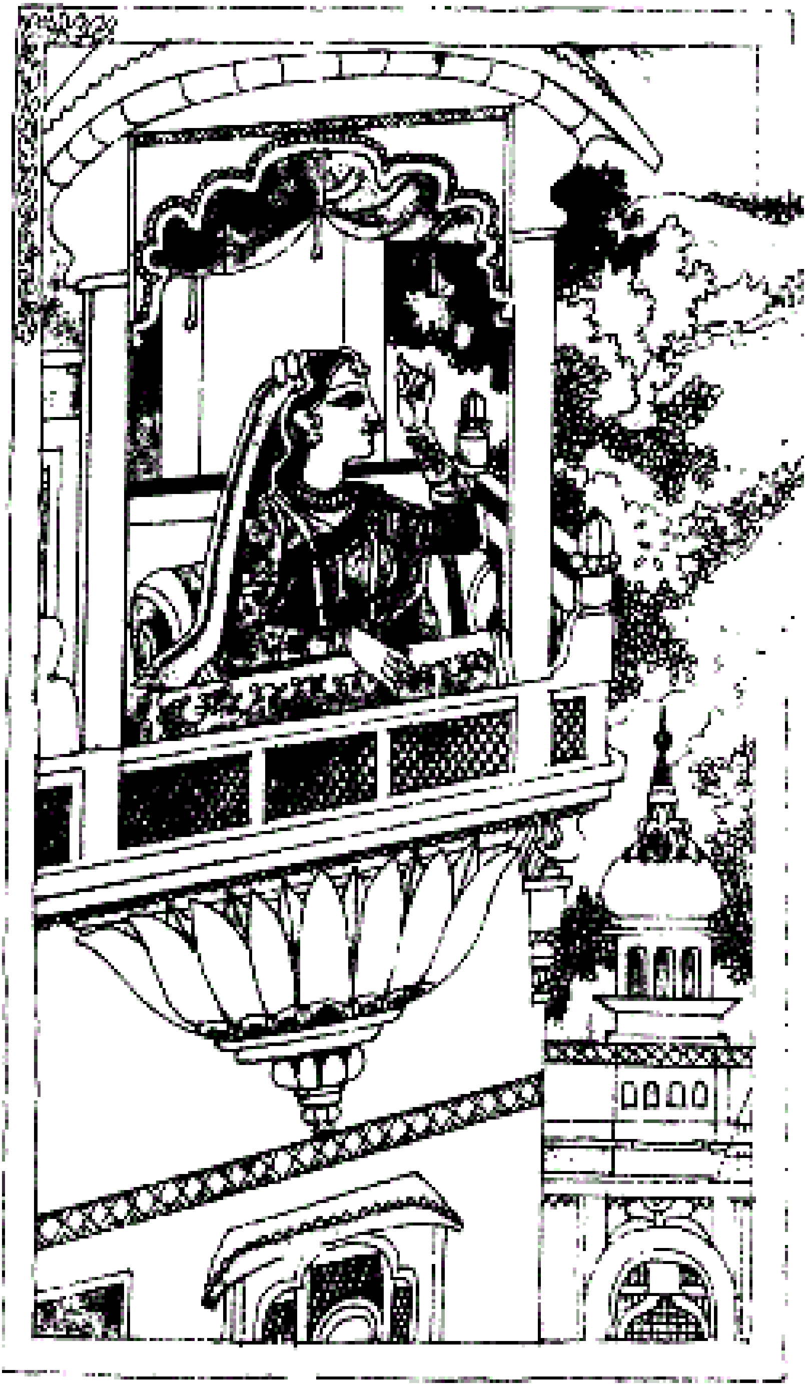

পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে-পাহাড়ে কালো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন—কখনো কোনো বুড়ো জাঠের মেঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায় ভেসে আসত! তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাপূজার ঘোর ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটের শাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন; আর মনে-মনে বলতেন—'হে মা চামুণ্ডে, হে মা ভবানী, মহারাজকে ভালোয়-ভালোয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনো। ভগবতী, আমার যে ছেলে হবে, সে যেন মহারাজেরই মতো তেজস্বী হয়, তাঁরই মতো যেন নিজের রানীকে খুব ভালোবাসে।' হায় মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না! পুষ্পবতী রাজারই মতো তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যে বড়ো সাধ ছিল—সেই শ্বেতপাথরের বারাণ্ডায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন—তাঁর যে বড়ো সাধ ছিল নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতো পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন—সে সাধ কোথায় পূর্ণ হলো? তাঁর সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল, এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো না।

যে-দিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেই দিন চন্দ্রবতীর রাজপ্রাসাদে রানী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে সেই রুপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল, কেবল সূর্যমূর্তির নিচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র।

পুষ্পবর্তী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে

সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মতো বিঁধে গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ-ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেলল।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল; তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—‘মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সেখানে সর্বনাশ ঘটল!’ রাজরানী বললেন—‘আর কটা দিন থেকে যা, ছেলেটি হয়ে যাক।’ পুষ্পবতী বললেন—‘না, না, না, মা!’

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশিজন রাজপুত বীর, আর দুটো উটের পিঠে নীল রেশমী-মোড়া একখানি ছোটো ডুলি, বড়ো রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল। চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া-পাহাড়ের নিচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে, উটে চড়ে বল্লভীপুরে যেতে হয়, আর অন্য পথ নেই। পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে, শিলাদিত্য আর নেই। বিধর্মী ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে।

পুষ্পবতীর চোখে একফোঁটা জল পড়ল না, তাঁর মুখে একটিও কথা সরল না, কেবল তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মতো ধূ-ধূ করতে লাগল; তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বালির উপর ছড়িয়ে দিলেন, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন। তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মতো সেই মালিয়া-পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন।

মরুপারে দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রানীর কোলে অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল। নাম রইল গোহ।

রানী পুষ্পবতী সেইদিন বীরনগর থেকে তাঁর ছেলেবেলার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আশিজন রাজপুত বীরের সম্মুখে তাঁর বড়ো সাধের রাজপুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বললেন— 'প্রিয় সখী, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মতো একে মানুষ কোরো। তোমায় আর কি বলব ভাই? দেখ রাজপুত্রকে কেউ না অযত্ন করে! আর ভাই, যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই একমুঠো ছাই কার্তিক পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও—যেন আমাকে জন্মান্তরে আর বিধবা না হতে হয়।' ঝরঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল; শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত রানী, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন। দেখতে-দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল। চারিদিকে রব উঠল—'জয় মহারানীর জয়! জয় সতীর জয়!' কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে, আর

সেই ছাই মুঠো এক হাতে নিয়ে, চোখের জল মুছতে-মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুতবীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন।

চন্দ্রাবতীর রাজরানী অনেকবার গোহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত-বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেননি। তাঁরা বলতেন—'আমাদের মহারানী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন, আমরাই তাঁকে পালন করব। বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন! এই তাঁর রাজপ্রাসাদ!'

গোহ সেই বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন।

কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মতো নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন; কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখাপড়া পছন্দ হত না, তিনি বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, কোনো দিন ভীলদের সঙ্গে ভীলবালকের মতো, কোনো দিন বা সেই রাজপুত-বীরদের সঙ্গে রাজার মতো, কখনো ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার করে, কখনো বা জাল ঘাড়ে বনে-বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন!

মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর। সেখানে যত শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরণার ঝর্ঝর, আশ্চর্য-আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে-বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো

তেজস্বী, অথচ ছোটো একটি ছেলের মতো সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন।

গোহ একদিন সেই সকল ভীল-বালকদের সঙ্গে ভীল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বল্লম-হাতে বাঘের ছালপরা হাজার-হাজার ভীল-বালক, ঘোড়ায় চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে 'আমাদের রাজা এসেছে রে! রাজা এসেছে রে!' বলে, মাদল বাজিয়ে নাচতে-নাচতে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে সেই ছেলের পাল গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল। তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভীলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন—'হাঁ রে, কোথায় রে তোদের নতুন রাজা?' ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে। তখন সেই বুড়ো ভীল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন—'ভালো রে ভালো, নতুন রাজার কপালে তিলক লিখে দে।' তখন একজন ভীল-বালক নিজের আঙুল কেটে বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে, রক্তের ফোঁটা দিয়ে গোহের কপালে রাজতিলক টেনে দিল, ভীলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয়, এমন সাধ্য কারো নেই।

গোহ সত্য-সত্যই রাজা হয়ে ভীলদের রাজসভায় বুড়োরাজার কাঠের রাজসিংহাসনের ঠিক নিচে একখানি ছোট পিঁড়ির উপর বসলেন। এই পিঁড়িখানি অনেকদিন শূন্য পড়ে ছিল; কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান। তাঁর দীনদুঃখী সামান্য প্রজা, তাদের ঘর-আলো-করা কালো বাঘের মতো কালো ছেলে; কিন্তু হায়, রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার, চিরকাল শূন্য ছিল! সেদিন যখন সমস্ত ভীলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পরে গোহ যুবরাজ হয়ে পিঁড়েয় বসলেন, তখন

বুড়ো মাণ্ডলিকের দুই চক্ষু সেই সুন্দর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল।

ভীলরাজের এক ছোটো ভাই ছিলেন। দশ বৎসর আগে একদিন কী জানি-কী নিয়ে দুই ভাইয়ের খুব ঝগড়া হয়েছিল, সেই থেকে বিচ্ছেদ, দেখাশোনা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোটো ভাই হিমালয় পর্বত থেকে ভীল রাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন, এসে দেখলেন, রাজপুতের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে। রাগে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বললেন—'এ রে ভাইয়া! বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হয়েছিস? বাপের রাজ্যি ছেলেতে পাবে, তোর ছেলে হল না, তোর পরে আমি রাজা; রাজপুতের ছেলেকে পিঁড়েয় বসালি কী বলে।' মাণ্ডলিক বললেন—'ভাইজি, ঠাণ্ডা হ।' ভাই-রাজ বললেন—'ঠাণ্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব।' এই বলে মাণ্ডলিকের ভাইজি রাগে ফুলতে-ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাণ্ডলিক বললেন—'দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি।' তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে বসে গোহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভীল সর্দারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন, যেন সেইদিন থেকে সমস্ত ভীল-সর্দার বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে গোহকে রক্ষা করে— গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয়। তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল। অনেক আমোদ-আহ্লাদ করে গোহ বীরনগরে ফিরে গেলেন।

সেইদিন কী ভেবে গভীর রাত্রে ভীলরাজ মাণ্ডলিক গোহের কাছে চুপি চুপি গিয়ে বললেন—'গোহ, আমি তোকে ছেলের মতো ভালোবাসি, তোকে আমি

রাজা করেছি, তোর ছুরিখানা আমায় দে, আমি নিজের হাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব।' গোহ কোমর থেকে নিজের নাম-লেখা ধারালো ছুরি খুলে দিলেন।

ভীলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। পাহাড়ের গায়ে তখন জোনাকি জ্বলছে, ঝি ঝি ডাকছে, দূরে-দূরে দু-একটা বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাতদুপুরে ভাই-রাজার দরজায় ঘা দিলেন—কারো সাড়াশব্দ নেই! ভীলরাজ ধীরে-ধীরে ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন; দেখলেন, তাঁর ছোটো ভাই সামান্য ভীলের মতো মাটির উপরে এক-হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন।

ভীলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল; তিনি কালো-পাথরের পুতুলটির মতো ছোটো ভাইয়ের সুন্দর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে আর চোখের জল রাখতে পারলেন না। মনে ভাবলেন আমি কী নিষ্ঠুর! হায়, ছোটো ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি, আবার কিনা শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি।

মাণ্ডলিক কুড়ি বৎসরের সেই ভীল-রাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে ডাকলেন—'ভাইয়া!' একবার ডাকলেন, দুবার ডাকলেন, তারপর মুখের কাছ থেকে তার নিটোল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন—'ভাইয়া।'—কোনোই উত্তর পেলেন না। তখন বুড়ো রাজা ছোটো ভাইয়ের মুখের কাছে মুখ রেখে তা কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন—'ভাইয়া রাগ করেছিস? ভাইয়া আমার সঙ্গে কথা কইবিনে ভাইয়া? আমি তোর জন্যে হিমালয়ের আধখানা জয় করে রেখেছি, সেইখানে তোকে রাজা করব; তুই উঠে বস, কথা ক! ওরে ভাই, কেন তুই এই দশ বছর আমায় ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি। কেন আমার কাছে-কাছে চোখে-চোখে রইলিনে ভাই? আমি সাধ করে কি রাজপুতের

ছেলেকে ভালোবেসেছি? তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না; সে সময়ে গোহ আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল! ভাই ওঠ্, আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি, আবার তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি, এই নে ছুরিখানা—আমার বুকে বসিয়ে দে, সব গোল মিটে যাক।'

মাণ্ডলিক ভায়ের হাতে ছুরিখানা জোর করে গুঁজে দিলেন। ধারালো ছুরি ভাই-রাজের মুঠো থেকে খসে পড়ল—'বুড়ো রাজা চমকে উঠলেন, ছোটো ভাইয়ের গা-টা যেন বড়োই ঠাণ্ডা বোধ হল! কান পেতে শুনলেন, নিঃশ্বাসের শব্দ নেই! তিনি 'ভাইয়া! ভাইয়া!' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা-ভাইকে ছেড়ে রাজসিংহাসনে গোহের উপরে গিয়ে পড়ল। গোহ যদি না থাকত, তবে তো আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছোটো ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন; তবে কি আজ ভীলরাজকুমার রাজ্যহারা হয়ে রাগে-দুঃখে বুক-ফেটে মারা পড়ত? মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ ধরে ছোটো ভাইটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন; কিন্তু হায়, খাঁচা ফেলে পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনি সেই ভীল বালকের সুন্দর শরীর শূন্য করে প্রাণপাখি অনেকক্ষণ উড়ে গেছে।

মাণ্ডলিক আর সে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না, ছুরি হাতে সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রাণ যেন কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগল—'গোহ রে তুই কী করলি? আমার রাজ্য নিলি, রাজসিংহাসন নিলি, ভায়ে-ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটালি; গোহ তুই কি শেষে আমার শত্রু হলি?' হঠাৎ পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে দুটি ভীলের মেয়ে গলা ধরাধরি করে চলে গেল। একজন বলে গেল—''আহা কী সুন্দর রাজা দেখছিস ভাই!' আর একজন বললে—'নতুন রাজা যখন আমার হাত

ধরে নাচতে লেগেছিল, তখন তার মুখখানা যেন চাঁদপারা দেখলুম।' মাণ্ডলিক নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন হায়, এরি মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছে! ভীলরাজের মনে হলো যেন পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই।

তিনি শূন্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই সময় কালো ঘোড়ায় চড়ে দুইজন রাজপুত ভীলরাজের সামনে দিয়ে চলে গেল। একজন বললে—'ভাই, রাজকুমার আজ শুভদিনে ভীলরাজত্বের সিংহাসনে না বসে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে বসে রইলেন কেন?'

অন্যজন বললে—'গোহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতদিনন বুড়ো বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি যুবরাজের মতো তাঁর পায়ের কাছে বসবেন।' মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল; তিনি হাসি-মুখে মনে-মনে বললেন— 'ধন্য গোহ! ধন্য তার ভালবাসা।' হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন, ছোটো ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরটা নিঃশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। বুক যেন তাঁর ফেটে গেল, তিনি 'ভাই রে!' বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি, শিকারী কুকুরের দাঁতের মতো ভীলরাজের বুকে সজোরে বিঁধে গেল—'পাহাড়ে-পাহাড়ে শিয়ালের পাল চিৎকার করে উঠল—হায় হায়, হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

পরদিন সকালে একজন রাজপুত পাহাড়ের পথে বীরনগরে যেতে-যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন—ভীলরাজের রক্তমাখা দেহ, বুকে মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা! রাজপুত সেই ছুরি হাতে গোহের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ করেছ কী! আশ্রয়দাতা চিরবিশ্বাসী ভীলরাজকে খুন করেছ?' গোহ তৎক্ষণাৎ সেই

রাজপুতের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে, দুই হাতে চক্ষের জল মুছে, ভাই-রাজার সঙ্গে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাণ্ডলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে, সূর্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভীলরাজের রাজসিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন।

বাপ্পাদিত্য

তুষের আগুন যেমন প্রথম ধিক-ধিক, শেষে হঠাৎ ধূ-ধূ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভীলদের রাগ ক্রমে ক্রমে অল্পে-অল্পে বাড়তে বাড়তে একদিন দাউ-দাউ করে পাহাড়ে-পাহাড়ে, বনে-বনে দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা আট-পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোনো রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোনো ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত—'রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখের থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন। যখন কোনো রাজকুমার কোনো-একদিন শখ করে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তামাশা দেখতেন, তখন তাদের মনে পড়ত—এক বছর—'দুর্ভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানের গোলা আশ্রয়হীন দীনদুঃখী ভীল-প্রজাদের জন্য সারা বৎসর খুলে রেখেছিলেন। ভাগ্য-দোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোনো কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাসঘাতক বলে সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি হাতির পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীল-বাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত— হায় রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মতো তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মতো তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মতো সকলের আগে চলতেন।

এত অত্যাচার, এত অপমান, তবু সেই বিশ্বাসী ভীল-প্রজাদের সরলপ্রাণ আট-পুরুষ পর্যন্ত বিশ্বাসে, রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল! কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন; যখন গরীব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, খেত উজাড় করে তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না; তিনি যখন হাজার-হাজার ভীলের মেয়ে দাসীর মতো রাজপুতের ঘরে-ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন, যখন প্রতিদিন নতুন-নতুন অত্যাচার না হলে তাঁর ঘুম হতো না, শেষে সমস্ত ভীলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের একমাত্র আমোদ—বনে-বনে পশু শিকার—যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন করে একেবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভীল-প্রজাদের উপর এই নতুন আইন জারি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনোদিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত। দলের পর দল, বড়ো বড়ো ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত। সামান্য ভীলের একটি ছোটো ছেলের পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতরে চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে আজ শিকারের দিনে ঘরের ভিতর বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনই ছটফট করছে— এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হৈ-হৈ শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন। বজ্রের মতো ভয়ংকর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার-

হাজার হরিণ প্রাণ-ভয়ে পথ ভুলে ছুটতে ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত— শিকারীরা কেউ বল্লম-হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া-হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চিৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিংবা হরিণের ক্ষুরের খুটখাট শোনা গেল না— মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন— 'ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল-প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চল, আজ গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে পশুর সমান ভীলের দল শিকার করিগে।'

মহারাজার রাজহস্তি শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল— তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারদিকে ঘোড়ায়-চড়া রাজপুতের দুশো বল্লম সকালের আলোয় ঝকমক করতে লাগল! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন— 'চালাও!' তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভীল সেনাপতির মতো, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজহস্তির সম্মুখে এসে দাঁড়াল! নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল— 'বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর-একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শনশন শব্দে বেরিয়ে গেল! অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর চারিদিক থেকে

হাজার হাজার কালো বাঘের মতো কালো-কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতদের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে; একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না, কেবল সোনার সাজ-পরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ী ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল-সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মতো রাজবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক-একবার যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে দেখছিলেন এক সময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল, তারপর রানী দেখলেন, সেই পাহাড়ে-রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজের কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল— পিছনে তার শত-শত ভীল— কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীর ধনুক। মহারানী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ থেকে শাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে, তারপর দেখলেন, আগুনের মতো একটি তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটিকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলল; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপর ধড়ফড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারানীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শনশন শব্দে কেল্লার ছাদের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চিৎকার উঠল— সূর্যদেব মালিয়া পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন।

সে রাত্রি কী ভয়ানক রাত্রি। সেই মালিয়া-পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, আর মাঝে গুটিকতক রাজপুত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বৎসরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন! তিনি কতবার কত দাসীর নাম ধরে ডাকলেন— কারো সাড়া-শব্দ নেই। মহারাজের খবর জানবার জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চিৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারানীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না! রানী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোটো একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দরমহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন— রাত্রি অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদন্তের কাজ করা বড়ো-বড়ো দরজা খোলা— হাঁ-হাঁ করছে; অত বড়ো রাজপুরী যেন জনমানব নেই।

মহারানী অবাক হয়ে এক-হাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল; চামড়ার জুতো পরা রাজপুত বীরের মচমচ পায়ের শব্দ নয়; রুপোর বাঁকি পরা রাজদাসীর ঝিনিঝিনি পায়ের শব্দ নয়, কাঠের খড়ম-পড়া পঁচাত্তর বৎসরের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট পায়ের শব্দ নয়— এ যেন চোরের মতো, সাপের মতো খুসখাস, খিটখাট পায়ের শব্দ! মহারানী ভয় পেলেন। দেখতে-দেখতে অসুরের মতো একজন ভীল-সর্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল! মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন— ‘কে তুই? কী চাস?’ ভীল সর্দার বাঘের মতো গর্জন করে বললে— ‘জানিসনে আমি কে? আমি সেই দুঃখী ভীল, যার মেয়েকে তোর

মহারাজা দাসীর মতো চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কি সুখের দিন। এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েছি, আর এই হাতে তার ছেলেসুদ্ধ মহারানীকে দাসীর মতো বেঁধে নিয়ে যাব।' মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'ভগবান রক্ষা কর।' বলে তিনি সেই নীরেট সোনার বড়ো-বড়ো চাবির গোছা সজোরে ভীল-সর্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন। দুরন্ত ভীল 'মা রে!' বলে চিৎকার করে ঘুরে পড়ল; মহারানী কচি বাপ্পাকে বুকে ধরে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন— তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানী পথ চলতে লাগলেন— পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বারবার পথ ভুল হতে লাগল— তবু রানী পথ চললেন। কত দূর! কত দূর!— পাহাড়ের পথ কত দূর? কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নেই। রানী কত পথ চললেন, তবু সে পথের শেষ নেই! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশে-পাশে বীরনগরের দু-একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল। পাহাড়ী হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা পাখিরাও তখন জাগেনি, এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। আটপুরুষ আগে, একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন। আর আজ আবার কতকাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিহ্লোট-রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

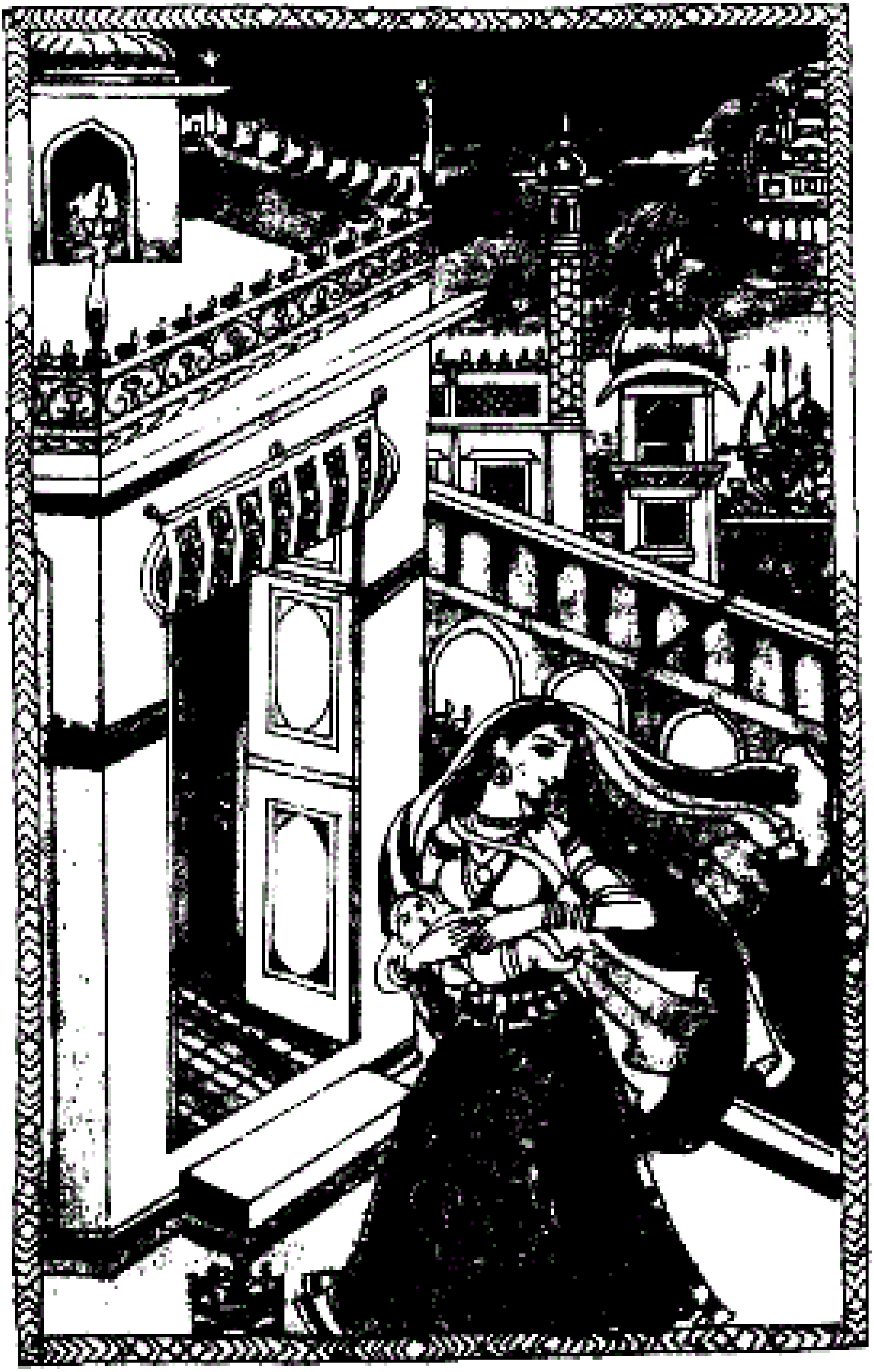

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেইদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোটো-ছোটো দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিলে। এদের পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথমে নিজের আঙুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজ তিলক টেনে দিয়েছিল—আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে, বিদ্রোহী ভীলেরা তাদের ঘর দুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে

পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছুদিন কাটালেন। কিন্তু সেখানেও ভীল রাজা; সেখানেও ভয় ছিল— কোন দিন কোন ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন করে। ব্রাহ্মণ যে মহারানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিপদে-সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন। তিনি একেবারে ভীল রাজত্ব ছেড়ে তাদের কটিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে গেলেন। একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মতো ত্রিকূট পাহাড়, আর একদিকে মেঘের মতো অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে নগেন্দ্রনগর, কাছাকাছি শোলাঙ্কি বংশের একজন রাজপুত রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরে ব্রাহ্মণ-পাড়ার গা ঘেঁষে ঘর বাঁধলেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁর ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল, আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুটি ভাই— ভীল বালিয় ও দেবকে নিয়ে মাঠে-মাঠে বনে-বনে গরু চরিয়ে রাখাল-বালকদের সঙ্গে রাখালের মতো খেলে বেড়াতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে, বাপ্পা রাজার ছেলে; কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন— তাঁর মনে বড়ো ভয় ছিল পাছে কোনো ভীল বাপ্পার সন্ধান পায়।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড়ো হয়ে উঠলেন; যখন মাঠে-মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ওঠা-নামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন-দিন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠল; যখন তিনি ক্ষেপা মোষ এক হাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন; সমস্ত রাখাল-বালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মতো বাপ্পাকে ভয়, ভক্তি, সেবা করতে লাগল তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত

হলেন। তখন তিনি বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া পাহাড়ের গল্প, সেই ভীল-বিদ্রোহের গল্প, সেই রানী পুষ্পবতী, মহারাজ শিলাদিত্য, রাজকুমার গোহ, তাঁর প্রিয়বন্ধু মাণ্ডলিকের কথা একে-একে বলতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে কখনো বাপ্পার চোখে জল আসত, কখনো বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখনো ভয়ে প্রাণ কাঁপত। বাপ্পা সারা-রাত্রি কখনো সূর্যের মন্ত্র, কখনো পাহাড়ের ভীলের যুদ্ধ, স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন, মনে ভাবতেন— আমিও কবে হয়তো রাজা হব, লড়াই করবো।

এমনিভাবে দিন কাটছিল। সে সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন-নতুন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুতদের বড়ো আনন্দের দিন; সকাল না হতে দলে দলে রাখাল নুতন কাপড় পরে, কেউ ছোট ভাইবোনকে কোলে করে, কেউ বা দইয়ের ভার কাঁধে নিয়ে, একজন তামাশা দেখতে অন্যজন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্র-নগরের রাজপুত-রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই— ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকল— ‘ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি?’ বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন— ‘না, যাব না।’ হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল— আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দে মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনীদিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে-হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটি মাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ

পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝির ঝিনিঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়োই একা একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনীদিদির মুখে শোনা ভীল রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান, ছোটো একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল! আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল— ঐ পশ্চিমের দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন; সে বাড়ি কী সুন্দর! সে চাঁদের কী চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত— তাদের কী সুন্দর রঙ, কী সুন্দর গলা! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন— বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বললেন— 'শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখাল-রাজা বাঁশি বাজাচ্ছে!' সখীরা বললে— 'আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপা গাছে দোলা খাটিয়ে ঝুল্‌নো-খেলা খেলি আয়!' কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নেই যে! সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই

বাদল দিনের গরু গর্জন, সেই দূরে বনে রাখাল রাজের মধুর বাঁশি, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগযুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো! এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবার সেই বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল! রাজকুমারী তখন হীরে-জড়ানো হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বললেন— 'যা ভাই, এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।'

রাজকুমারীর সখী সেই বালা-হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে— 'এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?' হাসতে হাসতে বাপ্পা বললেন— 'পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করে!'

সেই দিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেতে ঘিরে-ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল— 'আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ!' খেলা শেষ হলো, সন্ধ্যা হলো, রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন— আজ কী আনন্দ!

হঠাৎ একটুখানি পুবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে হু-হু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল। সেই সঙ্গে বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে চাঁপাগাছের সবুজ পাতার উপরে ঝরে পড়ল। বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে

দেখলেন— পশ্চিমদিক থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে— মাঝে-মাঝে গুরু গুরু গর্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে। বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, মনে পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে। দুধের মতো শাদা তাঁর ধবলী গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে। তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাদন খুলে নিয়ে ধবলী গাইটির সন্ধানে চললেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে-মাঝে গাছে-গাছে রাশি-রাশি জোনাকি-পোকা হীরের মতো ঝকঝক করছে, আর জায়গায়-জায়গায় ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করছে। বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে-পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায়, ঘন বেতের বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন— এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দীর মতো তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই শাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মতো একটি শ্বেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা-আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকাল-বেলায় পদ্মের পাপড়ির মতো ধীরে-ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বললেন— 'শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমায় আশীর্বাদ করছি— তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও। তোমার ধবলীর দুধের ধারায় আজ আমি বড়োই তুষ্ট হয়েছি। আজ আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষদিনে তোমায় আর কী দেব? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর— এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়— এই দুটি তুমি লও। আর বৎস, ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেতপাথরের মূর্তিটি সঙ্গে রেখ, সর্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম

হল— একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নামেই সিংহাসনে বসবে।' তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতা জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে দেখতে তাঁর পবিত্র শরীর আগুনের মতো ধূ-ধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের মূর্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে পিছনে ফিরে চললেন— মেঘের গুরু-গুরু দেবতার দুন্দুভির মতো, সমস্ত আকাশজুড়ে বাজতে লাগল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে, মেলা শেষে মলিন মুখ যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।

কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন-পূর্ণিমার খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন আগেই নাকি কোন বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে। আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে— রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায়-ভাবনায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক-পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন— 'পিতা, আমায় বিদায় দাও। আমি তো এখন বড়ো হয়েছি আমার জন্যে তোমরা কেন বিপদে পড়? ব্রাহ্মণ বললেন— 'বৎস, তুমি জানো না তুমি কে; তুমি রাজপুত্র, তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন; আমি আজ এই অল্প-বয়সে একা ভিখারীর মতো তোমাকে কেমন করে বিদায় করব?' বাপ্পা তখন ভগবতীর

সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বললেন— ‘পিতা, বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী;’ ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন— ‘যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে, রাজারই মতো ধনুঃশর হাতে পেয়েছ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করছি— পৃথিবীর রাজ হও। যদি কেউ তোমার পরিচয় চায়, তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন। যাও বৎস, সুখে থাক!’

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীলনীদিদির কাছে বিদায় নিতে চললেন কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততোটা সহজ হল না। অনেক কাঁদাকাটার পর ভীলনীদিদি বললেন— ‘বাপ্পা রে, যদি যাবি তবে তোর দুই ভাই— বালিয় ও দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন কেমন করে যে!’ তারপর তিনজনের হাতে তিন-তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনীদিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়ো-বড়ো পাথরের থামের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে; কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে; কোথাও বাঘের গর্জন, কোথাও বা পাখির গান; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, তার-জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনো বনের মনোহর শোভা দেখতে দেখতে কখনো মহা-মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চললেন।

সেই প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল, রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত, পথে-পথে কাটিয়ে, বাপ্পা মেবারের মৌর্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি চাল-ডাল, তাম্বু-কানাত; গরুর গাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার-দাবার; বড়ো-বড়ো জালায় খাবার জল রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে; রাস্তায় রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে-সন্ধানে ফিরছে। মহারাজ মান নিজে সামন্ত-রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন— চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড়ো-বড়ো পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্যন্ত কখনো দেখেননি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তার মাটির দেয়াল; সেখানেও মন্দির ছিল, কিন্তু সে কত ছোটো! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড়ো-বড়ো হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময়ে রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন; শাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজছত্র ঝলমল করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ূর-পাখার চামর দোলাচ্ছে। বাপ্পা ভাবলেন— রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুমি

কী চাও?' বাপ্পা বললেন— 'আমি রাজপুত রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই!' এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে! চারিদিকে বড়ো-বড়ো সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন— এ কোনো ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান যুদ্ধের সময় এই বীরপুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মানরাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্য আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন— 'মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন!' তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন— সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল— 'হ্যাঁ, বীর বটে; যেমন চেহারা, তেমনি শরীর! চারিদিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান-রাজার উপর মনে-মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন-দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেইদিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত-রাজা, যত বুড়ো-বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন— 'মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালোবাসা ভুলে

একজন পথের ভিখারীকে আমাদের সকলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল— তবে আমাদের আর কাজ কী? বাপ্পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি কর; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন করে যুদ্ধ করেন দেখা যাক!' মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলবার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় এই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পনেরো বৎসরের বীর-বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুনুন মহারাজ! আজ রাজস্থানের প্রধান-প্রধান সর্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন— এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান; তবে তাই হোক!' রাজা মান হতাশের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর ধীরে-ধীরে বললেন— 'তবে তাই হোক।' তারপর একদিক দিয়ে মূর্ছিতপ্রায় মান-রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন; আর একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন।

বিদ্রোহী-সর্দারদের মাথা হেঁট হলো। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে, পনেরো বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনোই সাহস পাবে না— সভার মাঝে অপমান হবে; কিন্তু যখন সেই বীর-বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ংকর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা আরও আশ্চর্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা— যাঁকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী বলে ঘৃণা করেছেন— পনেরো বৎসরের সেই বালক বাপ্পা— যুদ্ধ জয় করে কোটি-কোটি রাজপুত-প্রজার আশীর্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে

সমস্ত রাজস্থানের রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন। সেদিন সমস্ত রাজস্থান বেড়ে কী আনন্দ, কী উৎসাহ।

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ংকর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেদিন রাজা মানের বুড়ো-বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ন মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন। মহারাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার চেষ্টা করলেন, কাকুতি-মিনতি, এমন কি শেষে রাজগুরুকে পর্যন্ত তাদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, সর্দারেরা দূতের মুখে বলে পাঠালেন— 'আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি, একবৎসর পর্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।'

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র কত ভয়ংকর পরামর্শে কেটে গেল। এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দারের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন। রাজা মান যখন শুনলেন বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন; যখন শুনলেন যে-বাপ্পাকে তিনি পথের ধুলো থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভেবেছিলেন— হায় রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ; যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান-রাজা প্রাণ দিলেন।

ষোলো বৎসরের বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে হিন্দুমুকুট, হিন্দু-সূর্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন। বালিয় ও দেব দুটি ভাই ভীল, বাপ্পার কপালে রাজতিলক টেনে দিয়ে দুখানা গ্রাম বকশিশ পেলে। বাপ্পা সেদিন নিয়ম করে দিলেন যে, তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই দুই ভীলের বংশবাবলীর হাতে রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে। আজও সেই নিয়ম চলে আসছে। এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত করলেন, তখন এই ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার কথা যে শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল; কিন্তু মান রাজার সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন, ইনি কি তবে গিহ্লোট-রাজকুমার গোহের বংশীয়?— সূর্যবংশেই তো ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা নাগাদিত্যের মহিষী চিতোর-রাজকুমারীর ছেলে নয়তো? রাজা মান, বাপ্পার মায়ের ভাই মামা নয়তো? ছি! ছি! বাপ্পা কি অধর্ম করলেন— চোরের মতন মামার সিংহাসন আপনি নিলেন? এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ? পণ্ডিতেরা আর রাজসভা মুখো হলেন না— একে-একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। হায়, তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা কত নির্দোষ; বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা। তিনি তাঁর পালক পিতা সেই রাজপুরোহিতের কাছে ভীল-বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না, যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভীলেরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ রাজকুমার গোহ, যাঁকে পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্পা ভাবতেন তিনি কোনো সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতা দেবীর সোনার মূর্তি সঙ্গে এনেছিলেন। চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেত-পাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পুজো করতেন।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে উঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড়ো হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সূতোয় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল— অনেকদিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামোতির কুড়িগাছা হারের নিচে থেকে সেই পুরোনো কবচখানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল, তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন, এ কী! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলুম! আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে! বাপ্পা প্রফুল্ল-মুখে সেই তামার কবচ মহারানীর হাতে এনে দিয়ে বললেন— 'পড় তো শুনি।' বাপ্পা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারানী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে— 'বাসস্থান ত্রিকূট পর্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর-অরণ্য।' বাপ্পা হাসিমুখে রানীর কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরে ঝুলন পূর্ণিমায় সেই জ্যোৎস্না-রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মতো আমার এখনো মনে আসে! আমি কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে চুড়ো পাহাড় কত আছে, কে তার সন্ধান পাবে! আমি যদি বলতে পারতেম

যে সেই মেঘের মতো তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে ‘ত্রিকূট’ বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোটো শহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানতে পারতেম সেই ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতাম, যেখানে ঝুলন-পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন, সেটি পরাশর-অরণ্য, তবে কোনো গোলই হতো না; হায় হায়! জন্মাবধি লেখা-পড়া না শিখে এই ফল। এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি-রাজনন্দিনীকে ফিরে পাব? পড় তো শুনি আর কী লেখা আছে?’ রানী কবচের আর-এক পিঠ উল্‌টে পড়তে লাগলেন— ‘জন্মস্থান মালিয়া-পাহাড়, পিতানাগাদিত্য, মাতা চিতোর কুমারী, নাম বাপ্পা।’

মহারানীর বড়ো বড়ো চোখ মহাবিস্ময়ে আরও বড়ো হয়ে উঠল— তিনি তামার সেই কবচ হাতে বাপ্পার পায়ের তলায় ফুলের বিছানার মতো সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন; আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মতো বড়ো একখানা প্রবালের আঙ্‌টির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, হায়, হায়! কী পাপ করেছি! এই হাতে পিতৃহন্তা ভীলদের শাসন না করে, মামার প্রাণহন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি। ‘মহারানী! আমি মহাপাপী, আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। এখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়-বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।’

একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেই দিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বের হলেন। তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া-পাহাড়ে ভীল রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা মারিয়া পাহাড় জয় করে, ভীল রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন। তারপর দেশ-বিদেশ— কাশ্মীর, কাবুল,

ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরান, তুরান জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল; মালিয়া পাহাড় জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল, আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল, কিন্তু তবু মনের শান্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনো দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর হাসি-মুখ মনে পড়ত; যখন কোনো নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিকে ঘিরে-ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। শেষে যেদিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটির মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাঙ্কি-রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তব্ধ অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে— সে রাজকুমারীও নেই সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙে গেল, তিনি শান্তিহারা পাগলের মতো সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্দরে একা মহারানীকে নিয়ে পড়ে রইল।

এই রকম দেশ-বিদেশে ঘুরতে-ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নীনগরে— যেখানে দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হলেন। একদিন ষোল বৎসর বয়সে রাজা মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী-নগর

থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চিতোর ফিরে গিয়েছিলেন; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়ে এসেছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরোনো হয়ে এসেছে সেই সময় বাপ্পা আর একবার সেই গায়নী-নগরে ফিরে এলেন। গায়নী-নগর দেখে বাপ্পার সেই দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবীর গল্প মনে পড়ল।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের জলে সূর্য-পূজা করে গায়নীর রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের শয়ন-মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে-শুনতে বাপ্পা ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়নমন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপধপ করছে। আকাশে আধখানি চাঁদ; চারিদিক নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন! হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন— 'আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!'— এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত-রাজকুমারীর ঝুলন গান!

বাপ্পা ছাদের উপর ঝুকে দাঁড়ালেন; নিচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে— 'আজ কী আনন্দ!' বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন। সেই চাঁদের আলোয় নির্জন শ্বেতপাথরের ছাদে পথের ভিখারিণী রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি— রাজকুমারী? তুমি কি কখনো ঝুলনপূর্ণিমায় এক রাখাল-বালককে বিয়ে করেছিলে?' ভিখারিণী অনেক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের

দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটুখানি হেসে বললে— 'মহারাজ, অর্ধেক রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে এ কী তামাশা!' বাপ্পা বললেন— 'তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?' ভিখারিণী নিঃশ্বাস ফেলে বললে— 'আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে, আজ ভিখারিণী। মহারাজ আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা! একদিন পনেরো বৎসর বয়সে তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সেদিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাদের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলাম— কী সুন্দর মুখ, কী প্রকাণ্ড শরীর। আর আজ তোমায় কী দেখছি! সে শরীর নেই, সে হাসি নেই। এমন দশা তোমার কে করল? কোন রাজপুত-কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মতো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ?' বাপ্পা বললেন— 'সে কথা থাক; তুমি আবার সেই গান গাও।' ভিখারিণী গাইতে লাগল— 'আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।' বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল, বাপ্পা বললেন— 'নবাবজাদী তোমায় কী দেব বল!' ভিখারিণী বললে— 'আমার যদি রাজ্য থাকত তবে তোমায় বলতেম আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর— কিন্তু সে আশা এখন নেই, এখন আমি ভিখারিণী যে! আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে কাছে রাখ!' বাপ্পা বললেন— 'তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।'

তার পরদিন সেই মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা খোরাসান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেয়ালা হাতে বেগম-সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন-

গান শুনতে-শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে!

একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল। পূর্বদিকে— হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা; পশ্চিমে ইরানীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর পাঠানের দল, হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের কবর দিতে ব্যস্ত হলো। শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর একপিঠে আল্লার দোয়া লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার ওপর থেকে খুলে নেওয়া হল, তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না— কেবল রাশি-রাশি পদ্মফুল আর গোলাপফুল। চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজীর মন্দিরে মানস-সরোবরের জলে রেখে দিলেন। ইরানী বেগম একটি গোলাপফুল শখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ জলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন; আর সেইদিন হিন্দুস্থান ও ইরানীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন— ‘সখী, তোরা সেই গান গা।’ চারিদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে-ঘিরে গাইতে লাগল— ‘আজ কী আনন্দ।’

সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারী; আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ— দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।

পদ্মিনী

বাপ্পাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। তারপর থেকে সূর্যবংশের অনেক রাজা অনেকবার চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন, রাজ-সিংহাসন নিয়ে কত ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ, কত মহা-মহা যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অশ্রুপাতই হয়ে গেছে; কিন্তু এত রাজা, এত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কেবল জনকতক রাজার নাম আর গুটিকতক যুদ্ধের কথা সমস্ত রাজপুতের প্রাণে এখনো সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন মহারাজ খোমান— যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি আরব্য উপন্যাসের সেই বোগদাদের খালিফ হারুন আল রশিদের ছেলে আল মামুনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেকদিন বন্দী রেখেছিলেন, আশীর্বাদ করতে হলে এখানো যাঁর নাম করে রাজপুতেরা বলে— 'খোমান তোমায় রক্ষা করুন।' আর একজন রাজা মহারাজ সমরসিংহ— যেমন বীর তেমনি ধার্মিক। তিনি যখন নাগা-সন্ন্যাসীর মতো মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে পদ্মবীজের মালা গলায় ভবানীর খাঁড়া হাতে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসতেন, তখন বোধ হত যেন সত্যিই ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান কৈলাস থেকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছেন। তখনকার দিল্লীশ্বর চৌহান পৃথ্বীরাজের হাত থেকে শাহাবুদ্দীন ঘোরি যখন দিল্লীর সিংহাসনের সঙ্গে অর্ধেক-ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে এসেছিলেন, সেই সময় এই মহারাজ সমরসিংহ তেরো হাজার রাজপুত আর নিজের ছেলে কল্যাণকে নিয়ে অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা পৃথ্বীরাজের পাশে-পাশে কাগার নদীর তীরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। পৃথ্বীরাজ

সমরসিংহের প্রাণের বন্ধু— তাঁর আদরের মহিষী মহারানী, পৃথার ছোটো ভাই। দুইজনে বড়ো ভালবাসা ছিল। তাই বুঝি এই শেষ যুদ্ধে সমরসিংহ জন্মের মতো বন্ধুত্বের সমস্ত ধার শুধে দিয়ে চলে গেলেন। যখন যুদ্ধের দিনে প্রলয়ের ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পৃথ্বীরাজের লক্ষ-লক্ষ হাতি-ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত ছিন্ন-ভিন্ন, ছারখার হয়ে গেল, যখন জয়ের আর কোনো আশা নেই, প্রাণের মায়া কাটাতে না পেরে যখন প্রায় সমস্ত রাজাই পৃথ্বীরাজকে বিপদের মাঝে রেখে একে-একে নিজের রাজত্বের মুখে পালিয়ে চললেন, যখন একমাত্র সমরসিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন তুচ্ছ করে প্রাণের বন্ধু পৃথ্বীরাজের জন্য মুসলমানের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আগে সেই ধর্মাত্মা মহাবীর সমরসিংহ, তাঁর ষোলো বছরের ছেলে কল্যাণ, আর সেই তেরো হাজার রাজপুতের বুকের রক্তে কাগার নদীর বালুচর রাঙা হয়ে গেল, তবে পৃথ্বীরাজ বন্দী হলেন, তবে দিল্লীর হিন্দু-সিংহাসন মুসলমান বাদশা শাহাবুদ্দীনের হস্তগত হল। এখন সে শাহাবুদ্দীন কোথায়, কোথায় বা সেই দিল্লীর রাজভক্ত! কিন্তু যে ধর্মাত্মা বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করলেন, সেই মহাবীর সমরসিংহের নাম রাজপুত-কবিরের সুন্দর গানের মধ্যে চিরকাল অমর হয়ে আছে, এখনো রাজপুতানায় সেই গান গেয়ে কত লোক রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষা করে।

সমরসিংহের পর থেকে প্রায় একশ বৎসর কেটে গেছে। চিতোরের রাজসিংহাসনে তখন রানা লক্ষ্মণসিংহ আর দিল্লীতে পাঠান-বাদশা আল্লাউদ্দীন। সেই সময় একদিন রানা লক্ষ্মণসিংহের কাকা ভীমসিংহ, সিংহল-দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে করে সমুদ্রপার থেকে চিতোরে ফিরে এলেন। পদ্মের সৌরভ যেমন সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল করে ক্রমে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে যায়, তেমনি

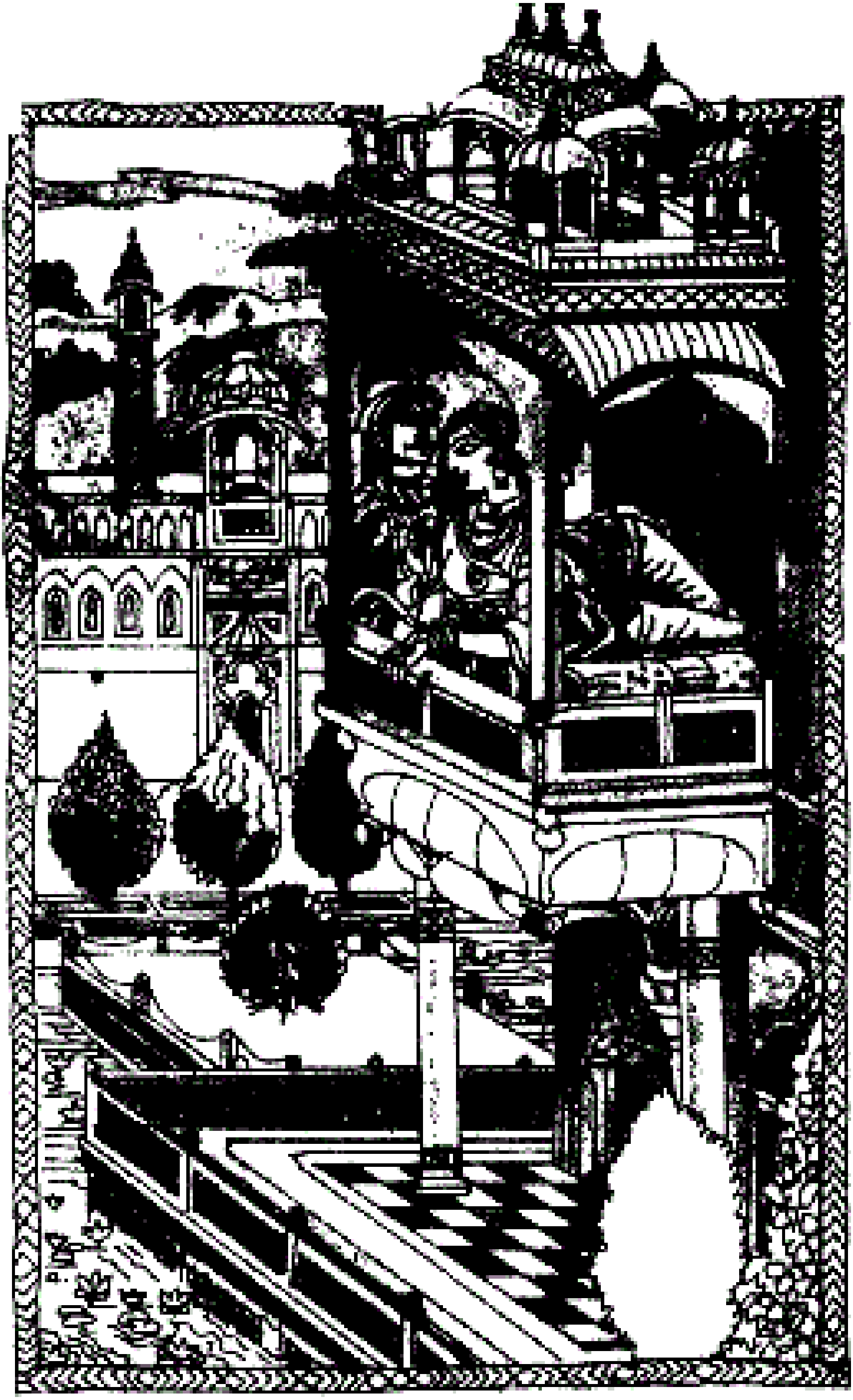

কমলালয়া লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী সেই পদ্মমুখী রাজপুত-রানী পদ্মিনীর রূপের মহিমা, গুণের গরিমা দিনে দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আমোদ করলে! কি দীন্‌দুঃখীর সামান্য কুটির, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ— এমন সুন্দরী, হেন গুণবতী কোথাও নেই।

এই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের এক ধারে শাদা-পাথরে বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজ-অন্তঃপুরের শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময়ে একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান-বাদশাহ আল্লাউদ্দীন, খাসমহলের ছাদে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে শরবতের পেয়ালা-হাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গান গাইছিল। বাদশা হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘কী ছাই, আরবী গজল। হিন্দুস্থানের গান গাও!’ তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল— ‘হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটেছিল— তার দোসর নেই, জুড়ি নেই। সে কী ফুল, আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল— চারিদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্মফুল! দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারিদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গভঙ্গে গর্জন করছিল। কার সাধ্য সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য যে রাজার বাগিচায় সে ফুল তোলে! সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!’ আল্লাউদ্দীন বলে উঠলেন, ‘আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোনো রাজারও তোয়াক্কা রাখি না, কোনো দেবতাকেও ভয় করি না। পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব!’ বাঁদী আবার গাইতে লাগল— ‘কে সেই ভাগ্যবান সিন্ধু হল

পার? কে সে গুণবান তুলল সে ফুল?— মেবারের রাজপুত-বীরের সন্তান— রানা ভীমসিংহ— নির্ভয়, সুন্দর!'

আল্লাউদ্দীন কিংখাবের সিংহাসনে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হল— 'আজ চিতোরের অন্তঃপুরে যে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা? জগতে তার জুড়ি কই? ধন্য রানা ভীমসিংহ! জয় রাজধানী— চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী।' আল্লাউদ্দীনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল— 'চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী!' তিনি আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন, 'বাঁদী তুই কি স্বচক্ষে পদ্মিনীকে দেখেছিস? সে কি সত্যই সুন্দরী?' বাঁদী উত্তর করলে, 'জাঁহাপনা! দিল্লী আসবার আগে আমি চিতোরে নাচ গান করে জীবন কাটাতেম; পদ্মিনীর বিয়ের রাত্রে আমি রানীর মহলে নেচে এসেছি।'

আল্লাউদ্দীন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন; কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, 'পিয়ারী আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি।' পিয়ারী বেগম বলে উঠলেন, 'শাহেনশা, আমার সাধ যায়, আকাশের চাঁদটাকে সোনার কৌটায় পুরে রাখি!' কথাটা আল্লাউদ্দীনের ভালো লাগল না। দিল্লীর বাদশা, যাঁর মুঠোর ভিতর অর্ধেক ভারতবর্ষ, তিনি কি একজন রাজপুত-রানীকে ধরে আনতে পারেন না? শাহেনশা মুখ গম্ভীর করে উঠে গেলেন— মনে-মনে বলে গেলেন, 'থাক পিয়ারী, যদি পদ্মিনীকে আনতে পারি তবে তোমাকে তার বাঁদী হয়ে থাকতে হবে।'

তার পরদিন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে আল্লাউদ্দীন চিতোরের মুখে চলে গেলেন। পাঠান সৈন্য যে দিক দিয়ে গেল সেই দিকে পথের দুই ধারে, ধানের খেত, লোকের বসতি ছারখার করে যেতে লাগল।

তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে-দিকে আনন্দের রোল উঠেছে— 'হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়!' ঘরে-ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো-হো আর বাসন্তী রঙের বাহার। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি-খেলার মাঝখানে, একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল আল্লাউদ্দীন আসছেন— ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিতোরের সমস্ত আনন্দ একনিমেষে নিবে গেল! তখন কোথায় রইল রানার রাজসভায় ধ্রুপদ খেয়ালে হোরি বর্ণনা, কোথায় রইল রানীদের অন্দরে 'ফাগুনমে হোরি মচাও' বলে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে-লাল রাস্তায় দলে-দলে হাসি-তামাশা, আর কোথায় বা গোপালজীর মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর!

আবিরে গোলাপে লালে-লাল চিতোরের ঘরে-ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনার সঙ্গে আর-এক ভয়ংকর খেলার আয়োজন চলতে লাগল— সে খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা— তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের গর্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ! শেষে একদিন পাঠান-বাদশার কালো নিশান, শকুনির মতো মেবারের মরুভূমির উপর দেখা দিলে। ভীমসিংহ হুকুম দিলেন, 'কেল্লার দরজা বন্ধ কর।' ঝনঝন শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাউদ্দীন ভেবেছিলেন— যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব; কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিক যেমন ঢেকে রাখে, তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারিদিক দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে! সমুদ্র পার হওয়া সহজ,

কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব। পাঠান বাদশা পাহাড়ের নিচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রানা ভীমসিংহ পদ্মিনীর কাছে এসে বললেন, 'পদ্মিনী তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল, তেমনি সমুদ্র?' পদ্মিনী বললেন, 'তামাশা রাখ, তোমাদের এ মরুভূমির দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?' ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার ছাদে উঠলেন। অন্ধকার আকাশ— চন্দ্র নেই, তারা নেই, পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নীচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রানা এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো, শাদা-শাদা ঢেউ উঠছে দেখ।' ভীমসিংহ হেসে বললেন, 'পদ্মিনী, এ যে-সে সমুদ্র নয়; এ পাঠান-বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যদল! ঐ দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী; জলের কল্লোলের মতো ঐ শোন সৈন্যের কোলাহল! আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিণী মূর্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি।' ভীমসিংহ আরও বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো-পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রানা-রানীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রানার হাত ধরে

নেমে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল— একী অলক্ষণ! একী অলক্ষণ!

তার পরদিন পূবের আকাশে ভোরের আলো সবেমাত্র দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন রাজপুত সওয়ার পাঠান-শিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দীন তখন রুপোর কুর্সিতে বসে তশবী-দানা জপ করছিলেন; খবর হলো, 'রানা লক্ষ্মণসিংহের দূত হাজির।' বাদশা হুকুম দিলেন, 'হাজির হোনে কো কহো।' রানার দূত তিনবার কুর্নিশ করে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে বসলে, 'রানা জানতে চান বাদশার সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোরে উপস্থিত হলেন।' আল্লাউদ্দীন উত্তর করলেন, 'রানার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই, আমি রানার খুড়ো ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাকে পেলেই দেশে ফিরব।' দূত উত্তর করলে, 'শাহেনশা, আপনি রাজপুত-জাতকে চেনেন না, সেই জন্য এমন কথা বলছেন। রানার কথা ছেড়ে দিন, আমরা দুঃখী রাজপুত, আমরাও প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না; আপনি রানীর আশা পরিত্যাগ করুন, বরং শাহেনশার যদি অন্য-কিছু নেবার থাকে তবে—' আল্লাউদ্দীন দূতের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'হিন্দুস্থানের বাদশার এক কথা— হয় পদ্মিনী, নয় যুদ্ধ।' রানার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত-সর্দার একত্র হলেন, কী করে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? রাজস্থানের রাজ-মুকুটের সমান চিতোর; রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর। মুসলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড়ো-বড়ো হিন্দুরাজার

রাজত্ব ছারখার হয়ে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মতো এখনো অটল, এখনো স্বাধীন আছে। কী করে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরের উদ্ধার করা যায়? অনেকক্ষণ ধরে অনেক পরামর্শ তর্ক-বিতর্ক চলল। শেষে রানা ভীমসিংহ উঠে বললেন, ‘পদ্মিনীর জন্যে যখন চিতোরের এই সর্বনাশ উপস্থিত তখন না হয় পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোনো দুঃখ নেই; চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে!’ কথাটা বলে ভীমসিংহ একবার রাজসভার এক পারে, যেখানে শ্বেতপাথরের জালির পিছনে চিতোরের রানীরা বসেছিলেন, সেইদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বললেন, ‘মহারানা কী বলেন?’ লক্ষ্মণসিংহ বললেন, ‘যদি সমস্ত সর্দারের তাই মত হয়, তবে তাই করা কর্তব্য।’ তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত সর্দারের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘রানার বিপদে আমাদের বিপদ, রানার অপমানে আমাদের অপমান। পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নন, তিনি আমাদের রানীও বটে। কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবীশুদ্ধ লোক বলবে, রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তারা রানীর হয়ে লড়ে? মহারানা, আমরা প্রস্তুত, হুকুম হলে যুদ্ধে যাই!’ মহারানা হুকুম দিলেন, ‘আপাতত যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, সাবধানে কেল্লার দরজা বন্ধ রাখ, আল্লাউদ্দীন যতদিন পারে চিতোর ঘিরে বসে থাকুন!’ সভাস্থলে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। চারিদিকে চিতোরের সমস্ত সামন্ত-সর্দার তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন, সমস্ত রাজসভা একসঙ্গে বলে উঠল, ‘জয় মহারানার জয়! জয় ভীমসিংহের জয়! জয় পদ্মিনীর জয়!’ রাজসভা ভঙ্গ হল। সেই সময় রাজসভার এক-পারে, শ্বেতপাথরের জালির আড়াল থেকে সোনার পদ্মফুল লেখা একখানি লাল রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দারের মাঝে এসে

পড়ল। সর্দারেরা পদ্মিনীর হাতের সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে 'রানীর জয়!' বলে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

তারপর, দিন কাটতে লাগল। আল্লাউদ্দীন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোরের কেল্লা ঘিরে বসে রইলেন। বাদশার আশা ছিল যে কেল্লার ভিতর বন্ধ থেকে রাজপুতদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণের দায়ে পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধি করবে; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে সংবৎসর কেটে গেল, তবু সন্ধির নামগন্ধ নেই। বর্ষা, শীত কেটে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে, পাঠান সৈন্যেরা দিল্লীতে ফেরবার জন্যে অস্থির হতে লাগল। এমন গরমের দিনে দিল্লীতে চাঁদনি-চৌকে কত মজা! সেখানে কাফিখানায় কত আমোদ চলেছে! আর তারা কিনা, কী বর্ষা, কী হিম, এই হিন্দুর-মল্লুকে এসে খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে! এখানে না পাওয়া যায় ভালো পান তামাক, না আছে ফুলের বাগিচা, না আছে একটা লোকের মিষ্টি গলা— যার গান শুনলে ভুলে থাকা যায়। এখানকার লোকগুলোও যেমন কাঠখোট্টা, তাদের গানগুলোও তেমনি বেসুরো, পানগুলোও তেমনি পুরু, তামাকটাও তেমনি কড়ুয়া। এ হিঁদুর মুল্লুকে আর মন টেকে না।

আল্লাউদ্দীন দেখলেন, নিষ্কর্মা বসে থেকে তাঁর সৈন্যরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ইচ্ছা আরো কিছুদিন চিতোর ঘিরে বসে থাকেন; যে কোনো উপায়ে হোক সৈন্যদের স্থির রাখতে হবে। বাদশা তখন এক-একদিনে এক-এক দল সৈন্য নিয়ে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় একদিন শিকার শেষে আল্লাউদ্দীন শিবিরে ফিরে আসছেন। একদিকে সবুজ জনারের খেত সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজলের মতো নীল হয়ে এসেছে, আর একদিকে পাহাড়ের উপর

চিতোরের কেল্লা মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে, মাঝে সুঁড়িপথ সেই পথে প্রথমে শিকারী পাঠানের দল বড়ো বড়ো হরিণ ঘাড়ে গাইতে গাইতে চলেছে, তারপর বড়ো-বড়ো আমীর-ওমরা কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সব শেষে বাদশা আল্লাউদ্দীন— এক হাতে ঘোড়ার লাগাম আর হাতে সোনার জিঞ্জীব-বাঁধা প্রকাণ্ড একটা শিকরে পাখি! বাদশা ভাবতে-ভাবতে চলেছেন— এতদিন হয়ে গেল তবু তো চিতোর দখল হল না; সৈন্যেরা দিল্লী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত, আর কতদিন তাদের ভুলিয়ে রাখা যায়? যে পদ্মিনীর জন্যে এত সৈন্য নিয়ে এত কষ্ট সয়ে বিদেশে এলেন, সে পদ্মিনীকে তো একবার চোখেও দেখতে পেলেন না। বাদশা একবার বাঁ-হাতের উপর প্রকাণ্ড শিকরে পাখিটার দিকে চেয়ে দেখলেন। হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল— যদি কোনো রকমে দুখানা ডানা পাই, তবে এই বাজটার মতো চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসি! হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আল্লাউদ্দীন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ, নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুক্রোর মতো এক-জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে, একটুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন একটি পাখি ভয়ে চিৎকার করতে-করতে

সন্ধ্যার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর একটি পাখি প্রকাণ্ড সেই বাজের থাবার ভিতর ছটফট করছে; তিনি শিস দিয়ে বাজ পাখিকে ফিরে ডাকলেন, পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল; আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে-ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা-পাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন! আর সেই তোতাপাখির জোড়া-পাখিটি প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে-ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চলল! শেষে, ক্রমে-ক্রমে আস্তে-আস্তে, ভয়ে-ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি খাঁচায় ডানা-ভাঙা তার সঙ্গী তোতা ছটফট করছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বসল। ওমরাহ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতী এসে আপনি ধরা দিয়েছে!' আল্লাউদ্দীন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে চলেছিলেন; হঠাৎ ওমরাহের মুখে এই কথা শুনে তাঁর মনে হলো— যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয়তো সেই সঙ্গে রানী পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন।

বাদশা শিবিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভীমসিংহকে বন্দী করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। দু-একদিন পরেই রানার সঙ্গে কথাবার্তা হল যে আল্লাউদ্দীন সমস্ত পাঠান সৈন্য নিয়ে বিনা যুদ্ধে দিল্লীতে ফিরে যাবেন, তার বদলে, একমাত্র তিনি একখানি আয়নার ভিতরে রাজপুত-রানী পদ্মিনীকে একবার দেখতে পাবেন, আর চিতোরের কেল্লার ভিতর বাদশা যতক্ষণ একা থাকবেন ততক্ষণ তাঁর কোনো বিপদ না ঘটে সেজন্য স্বয়ং মহারানা দায়ী রইলেন। বাদশা চিতোর যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শিকার যে এত শীঘ্র ফাঁদে পা দেবে, আল্লাউদ্দীন স্বপ্নেও ভাবেননি; তিনি মহা আনন্দে পাঠান-ওমরাহদের নিয়ে সমস্ত পরামর্শ স্থির

করলেন! তারপর বৈকালে গোলাপ-জলে স্নান করে, কিংখাবের জামাজোড়া, মোতির কণ্ঠমালা, হীরে-পান্নার শিরপ্যাঁচ পরে শাহেনশা শাদা ঘোড়ার উপর সোনার রেকাবে পা দিয়ে বসলেন— সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দুশোজন পাঠান-বীর— যারা প্রাণের ভয় রাখে না, যুদ্ধই যাদের ব্যবসা। বাদশা ঘোড়ায় চড়ে একা পাহাড় ভেঙে কেল্লার দিকে উঠে গেলেন; আর সেই পাঠান সওয়ারেরা পাহাড়ের নিচে থেকে প্রথমে নিজের শিবিরে ফিরে গেল, তারপর আবার একে-একে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেল্লার কাছে ফিরে এসে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা আমবাগানের তলায় লুকিয়ে রইল।

সূর্যদেব যখন চিতোরের পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘের আড়ালে অস্ত গেলেন, সেই সময় পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দীন রানা ভীমসিংহের হাত ধরে পদ্মিনীর মহলে শ্বেতপাথরের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে আর জনমানব ছিল না— কেবল হাজার হাজার মোমবাতির আলো, সেই শ্বেতপাথরের রাজমন্দিরে, যেন আর-একটা নতুন দিনের সৃষ্টি করেছিল। রানা ভীম সেই ঘরে সোনার মছনদে বাদশাকে বসিয়ে তাঁর হাতে এক পেয়ালা সরবৎ দিয়ে বললেন, 'শাহেন শা, একটু আমিল ইচ্ছা করুন!' আল্লাউদ্দীন সেই আমিলের পেয়ালা হাতে ভাবতে লাগলেন— যদি এতে বিষ থাকে, তবে তো সর্বনাশ! রাজপুতের মেয়েরা শুনেছি, শত্রুর হাতে অপমান হবার ভয়ে অনেক সময় এই রকম আমিল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। বাদশা পেয়ালা হাতে ইতস্তত করতে লাগলেন। রানা ভীম আল্লাউদ্দীনের মনের ভাব বুঝে একটু হেসে বললেন, 'শাহেনশা, বিষের ভয় করবেন না। মহারানা স্বয়ং যখন আপনার কোনো বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী, তখন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে আসেন, তবু একজন রাজপুতও

আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না! আপনি নিশ্চিত থাকুন। অতিথিকে আমরা দেবতার মতো মনে করি।' আল্লাউদ্দীন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'রানা, আমি সে কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছিলেম, আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি, তেমনি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার কি না?' আল্লাউদ্দীন মুখে এই কথা বললেন বটে কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল। তিনি অল্পে-অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃশেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। শেষে যখন দেখলেন বিয়ের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তখন বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, 'তবে আর বিলম্ব কেন? এখন একবার সেই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনী রানীকে দেখতে পেলেই খুশি হয়ে বিদায় হই।'

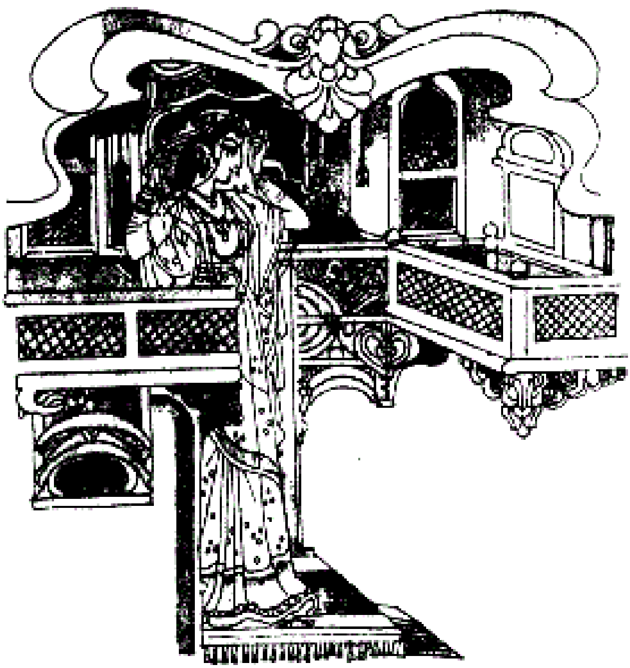

তখন রানা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটা পর্দা সরিয়ে দিলেন। কাকচক্ষু জলের মতো নির্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার-হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ হল! বাদশা দেখতে লাগলেন সে কী কালো চোখ! সে কী সুটানা ভুরু। পদ্মের মৃণালের মতো কেমন কোমল দুখানি হাত। বাঁকা মল-পরা কী সুন্দর দুখানি রাঙা পা! ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি, হীরের চিক্! বাদশা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন— একি মানুষ না পরী? আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনি মছনদ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া-পদ্মিনীকে ধরবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে ছুটে চললেন; গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায়! ভীমসিংহ বলে উঠলেন— ‘শাহেনশা, পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না।’ রানার মনে হলো, রাজদরবারের একদিকে বসে সত্যিই তাঁর পূণ্যবতী রানী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছে! রাগে রানার দুইচক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন— ঝনঝন শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আল্লাউদ্দীন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মনে বুঝলেন, পাগলের মতো রানীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়োই অভদ্রতা হয়েছে, এজন্য রানার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার।

বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, ‘রানা আমার অন্যায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত, তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিতুম। আমায় ক্ষমা করুন।’ তারপর অনেক

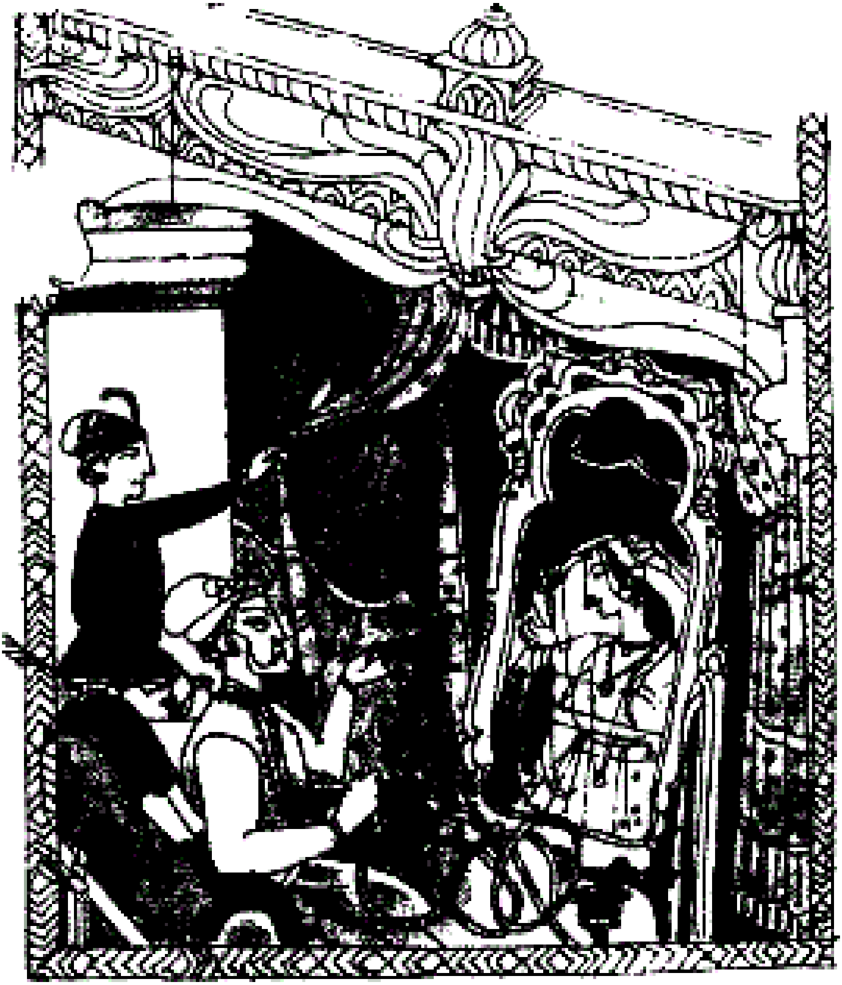

তোষামোদ, অনেক অনুনয়-বিনয়ে রানাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন। পেয়ালার পর পেয়ালা আমিল খেয়ে একেই রানার প্রাণ খুলে গিয়েছিল, তার উপর দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে যখন ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল— রানা আদর করে নতুন বন্ধু দিল্লীর বাদশাকে কেল্লার বাইরে পৌঁছে দিতে চললেন।

অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার; ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ— সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে; চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই, আল্লাউদ্দীন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রানা ভীম আর কুড়িজন রাজপুত সেপাই।

আজ রানার মনে বড় আনন্দ— চিতোরের প্রধান শত্রু আল্লাউদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর কখনো চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। রানা যখন ভাবলেন, কাল সকালে পাঠান সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন চিতোরের সমস্ত প্রজা কাল থেকে নির্ভয়ে রানা-রানীর জয়-জয়কার দিয়ে, যে যার কাজে লাগবে, তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে-পাশে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরও অন্ধকার হয়েছে; পাহাড়ের গায়ে বড়ো-বড়ো নিম-গাছ কালো-কালো দৈত্যের মতো রাস্তার দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল কেল্লার উপর থেকে এক একবার প্রহরীদের হৈ হৈ আর পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট।

আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহকে নিয়ে কথায়-কথায় ক্রমে পাহাড়ের নিচে এলেন। সেখানে একদিকে জনারের খেত, আর একদিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা। এই রাস্তার দুইধারে প্রায় দুশো পাঠান আল্লাউদ্দীনের হুকুম মতো লুকিয়েছিল। ভীমসিংহ যেমন এইখানে এলেন অমনি হঠাৎ চারিদিক থেকে পাঠান-সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলল; তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত-শত শত্রুর মাঝে কুড়িজন মাত্র রাজপুত তাদের রানাকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু বৃথা! বাজপাখি যেমন ছোঁ-মেরে শিকার নিয়ে যায়, তেমনি পাঠান

আল্লাউদ্দীন রাজপুতদের মাঝখান থেকে রানা ভীমকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কুড়িজনের মধ্যে পাঁচজন মাত্র রাজপুত চিতোরে ফিরল। প্রতিপদের সকালবেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল— ভীমসিংহ বন্দী হয়েছেন; পদ্মিনীকে না দিয়ে তাঁর মুক্তি নেই।

আল্লাউদ্দীন যখন শিবিরে পৌঁছলেন, তখন রাত্রি আড়াই প্রহর। তিনি ভীমসিংহকে সাবধানে বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন। আজ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হলো যে, রানা যখন ধরা পড়েছেন, তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়! হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, বাদশার বেগম হতে কি রাজি হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রানাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না।— আল্লাউদ্দীন মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা করে সোনার খাটিয়ায় দুধের ফেনার মতো ধপধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরানী পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন, এইবার পদ্মিনী আসছেন। সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল, পদ্মিনী এলেন না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলে গেল, তবু পদ্মিনীর দেখা নেই। বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন তাঁর মনে হতে লাগল এ-ভীমসিংহ কি আসল ভীমসিংহ নয়? আমি কি ভুল করে সামান্য কোনো সর্দারকে বন্দী করে এনেছি? আল্লাউদ্দীন বন্দী রানাকে হুজুরে হাজির করতে হুকুম দিলেন। লোহার শিকলে বাঁধা রানা ভীম বাঁধা সিংহের মতো বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন। শাহেনশা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ?’ রানা উত্তর করলেন, ‘পাঠান! এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?’ আল্লাউদ্দীন বললেন, ‘যদি তুমি সত্যই ভীমসিংহ তবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য রাজপুতদের কোনোই চেষ্টা দেখছি না যে?’ রানা বললেন, ‘যে মূর্খ

নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গে চিতোরের মহারানা বোধ হয় কোনো সম্বন্ধ রাখতে চান না!’ কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগল— যদি, সত্যিই ভীমসিংহকে পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকেন? আল্লাউদ্দীন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন।

সেই দিন শেষ রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাদে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীল পদ্মের মতো তাঁর দুটি সুন্দর চোখ, পাঠান শিবিরের দিকে— যেখানে ভীমসিংহ বন্দী ছিলেন, সেই দিকে চেয়ে ছিল। আকাশ তখনো পরিষ্কার হয়নি, পূর্বদিকে সূর্যের আলো সোনার তারের মতো দেখা দিয়েছে, এমন সময় দুজন রাজপুত-সর্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম করলেন। একজনের নাম গোরা, আরেকজনের নাম বাদল। গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর, আর তার বড়ো-ভাইয়ের ছেলে বাদলের বয়স বছর বারো। গোরা বাদল দুজনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক। রাজকুমারী পদ্মিনী যখন ভীমসিংহের রানী হয়ে সিংহল ছেড়ে চলে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এই গোরা এক হাতে তলোয়ার, আর এক হাতে মা-বাপ হারা কচি বাদলকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চিতোরে এসেছিলেন। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মহারানা কি আমার কথা-মতো কাজ করতে রাজি হয়েছেন?’ গোরা বললেন, ‘তাঁরই হুকুমে রানীজীকে পাঠান শিবিরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্যে এমনি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।’ পদ্মিনী একটু হেসে বললেন, যাও বাদশাকে বোলো, আমার জন্যে যেন দিল্লীতে একটা নতুন মহল বানিয়ে রাখেন।’

গোরা বাদল বিদায় নিলেন। দেখতে-দেখতে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করে সূর্যদেব উদয় হলেন। পদ্মিনী দেখলেন, আল্লাউদ্দীনের লাল রেশমের প্রকাণ্ড

শিবির সকালবেলায় সূর্যের আলোয় ক্রমে-ক্রমে রক্তময় হয়ে উঠল! তিনি বাদশাহের সেই কানাতের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন— 'ধূর্ত পাঠান, তোতে-আমাতে আজ যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেখি, কার কতদূর ক্ষমতা!'

সেদিন শুক্রবার, মুসলমানদের জুম্মা। আল্লাউদ্দীন ফজরের নমাজ করে দরবারে বসেছেন, এমন সময় মহারানার চিঠি নিয়ে গোরা বাদল উপস্থিত হলেন। বাদশা মহারানার মোহর করা চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা রয়েছে— 'পদ্মিনীকে বাদশার হাতে দেওয়াই স্থির হল, তার বদলে রানা ভীমসিংহের মুক্তি চাই! আরও, রাজরানী পদ্মিনী সামান্য স্ত্রীলোকের মতো দিল্লীতে যেতে পারে না, তাঁর প্রিয় সখীরাও যাতে পদ্মিনীর সঙ্গে থেকে চিরদিন তাঁর সেবা করতে পারেন, বাদশাহ যেন সে বন্দোবস্ত করেন; তাছাড়া চিতোরের রানী পদ্মিনীকে শাহেনশার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্যে যে-সব বড়ো বড়ো ঘরের রাজপুতনী সঙ্গে যাবেন, তাঁদের যাতে কোনো অসম্মান না হয়, সে জন্য বাদশা তাঁর সমস্ত সৈন্য কেল্লার সামনে থেকে কিছু দূরে সরিয়ে রাখবেন। শেষে মহারানার ইচ্ছা যে, এরপর থেকে আল্লাউদ্দীন আর যেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করেন। চিঠিখানা পড়ে বাদশার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল; তিনি হাসিমুখে গোরা বাদলের দিকে ফিরে বললেন, 'বেশ কথা! আমি আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ফৌজ কেল্লার সামনে থেকে উঠিয়ে নেব, রানীর আসবার কোনোই বাধা হবে না। তোমরা মহারানাকে জানাওগে তাঁর সকল কথাতেই আমি রাজি হলেম।'

গোরা বাদল বিদায় হলেন। বাদশা, কেল্লার সামনে থেকে সৈন্য উঠিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। একদিনের মধ্যে এত সৈন্য অন্য জায়গায় উঠিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বাদশা বললেন— তাম্বুকানাত, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র

যেখানকার সেইখানেই থাক, কেবল সেপাইরা নিজের ঘোড়া নিয়ে একদিনের মতো অন্য কোথাও আশ্রয় নিক। তাতেও প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরের প্রধান ফটক রামপালের উপর কড়কড় শব্দে নাকাড়া বাজতে লাগল। বাদশা দেখলেন, চিতোরের সাতটা ফটক একে-একে পার হয়ে চার-চার বেহারার কাঁধে, প্রায় সাতশো ডুলি তাঁর শিবিরের দিকে আসছে— মাঝি রানী পদ্মিনীর চিনা-পাত-মোড়া সোনার চতুর্দোল, তার এক-পাশে পঞ্চাশ বৎসরের সর্দার গোরা, আর একপাশে বারো বৎসরের বালক বাদল— দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে। পদ্মিনী আর তাঁর সহচরীদের থাকবার জন্যে বাদশা প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত ফেলেছিলেন। একে-একে যখন সেই সাতশো পাল্‌কি কানাতের ভিতরে পৌঁছল, তখন গোরা বাদশার হুজুরে খবর জানালেন, 'শাহেনশা, রানীজী উপস্থিত; এখন তিনি একবার ভীমসিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান— বাদশাহের বেগম হলে আর তো দুজনে দেখা হবে না।' বাদশা বললেন, 'পদ্মিনী যখন রানাকে দেখতে চেয়েছেন, তখন আর কথা কী! আমি আধঘণ্টা সময় দিলেম, তার বেশি রানা যেন পদ্মিনীর কাছে না থাকেন।' গোরা তথাস্তু বলে বিদায় হলেন।

আল্লাউদ্দীন একলা বসে দেখতে লাগলেন— এক, দুই করে প্রায় সাতশো পাল্‌কি, কানাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে, চিতোরের মুখে চলে গেল; সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বারো বৎসরের বাদল। বাদশা একজন ওমরাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সব পাল্‌কিতে কারা যায়?' শুনলেন, চিতোর থেকে যে-সকল বড়ো-ঘরের রাজপতুনী রানীকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তারা ফিরে গেলেন। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভীমসিংহ কোথায়?' উত্তর হল 'অন্দরে আছেন।'

আল্লাউদ্দীন শিবিরের এককোণে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, আধঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা হবে। বাদশা সাজগোজ করবার জন্য অন্য এক শিবিরে উঠে গেলেন। সেখানে আতর, গোলাপ, হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি— কোথাও সোনার আতরদানে হাজার-টাকা ভরি গোলাপী আতর, কোথাও মুক্তোর তাজ, পান্নার শিরপ্যাঁচ, কৌটো-ভরা-মানিকের আংটি, আলনায় সাজানো কিংখাবের জামাজোড়া, রেশমী রুমাল, জরির লপেটা।

বাদশা যতক্ষণ কিংখাবের জামাজোড়া, জরির লপেটা পরে আয়নার সম্মুখে পাকা দাড়িতে গোলাপী আতর লাগাচ্ছিলেন, ততক্ষণ সেই সাতশো পাল্‌কির একখানিতে রানা ভীমসিংহকে লুকিয়ে মেবারের বাছাবাছা রাজপুত-সর্দারেরা পাঠান-শিবিরের মাঝখান দিয়ে চিতোরের মুখে এগিয়ে চলেছেন।

ক্রমে আল্লাউদ্দীনের সাজগোজ সাঙ্গ হল। আধ-ঘণ্টা শেষ হয়ে একঘণ্টা পূর্ণ হতে চলল, এখনো পদ্মিনীর শিবির থেকে ভীমসিংহ ফিরে এলেন না! বাদশা গোরাকে ডাকতে হুকুম দিলেন; গোরার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে যেখানে আধক্রোশ জুড়ে কানাত খাটানো হয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হলেন; দেখলেন পদ্মিনীর সোনার চতুর্দোল শূন্য পড়ে আছে। যে লাল মখমলের প্রকাণ্ড শিবিরে তিনি চিতোরের রানী পদ্মিনীকে মানিকের খাঁচায় সোনার পাখিটির মতো পুষে রাখবেন ভেবেছিলেন, সে শিবির অন্ধকার। কোথায় পদ্মিনী কোথায় তাঁর একশো সখী, আর কোথায় বা বন্দী ভীমসিংহ; পাঠান-শিবিরে হুলস্থূল পড়ে গেল। সকলেই শুনলে পাল্‌কি-বেহারা সেজে রাজপুতেরা বন্দী রানাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল।

বাদশা তখনি সমস্ত সৈন্য জড়ো করতে হুকুম দিয়ে দুহাজার ঘোড়সওয়ার সঙ্গে চিতোরের মুখে বেরিয়ে গেলেন।

সবেমাত্র রানার পাল্‌কি চিতোরের ফটক পার হয়েছে, এমন সময় পাঠান বাদশার ঘোড়-সওয়ার কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন ধূলিধ্বজায় চারিদিক অন্ধকার করে দীন্‌-দীন্‌-শব্দে রাজপুত সৈন্যের উপর পড়ল।

তখন বেলা দুই প্রহর। আগুনের সমান তপ্ত রৌদ্রে বারো বৎসরের বালক বাদল আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গোরা, একদল রাজপুতকে নিয়ে প্রাণপণে চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু যুদ্ধের শেষ হল না। চিতোর থেকে দলের পর দল রাজপুত এসে যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল; বাদশা হাজারের পর হাজার পাঠান এনেও চিতোরের একখানা পাথর পর্যন্ত দখল করতে পারলেন না। শেষে, যে ভীমসিংহকে তিনি কাল রাত্রে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধ রেখেছিলেন, সেই ভীমসিংহ যখন হাতির পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, তখন পাঠান বাদশার আশা-ভরসা নির্মূল হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্ধেক-ভারতবর্ষের সম্রাট আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখ থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে শিবিরে গেলেন। জয়! জয়! রবে চিতোর নগর পরিপূর্ণ হল!

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধ-শেষে রানা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়ন-কক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন, তখন রানার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ সুখের দিনে চক্ষে জল কেন?’ রানা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘পদ্মিনী, আজ আমার পরম উপকারী চিরবিশ্বাসী গোরা চিরদিনের মতো যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে, দেবলোকে চলে গেছে।’ দুজনে আজ একটিও কথা হলো না! রানী পদ্মিনী শয়ন-ঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন; দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের

মহাশ্মশানের দিক থেকে যেন একটা হায়-হায়-হায়-হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।

আল্লাউদ্দীন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর ঘিরে বসেছিলেন সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল একটু একটুও করে ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল! রাজপুতের কাছে হার মেনে বাদশা নিজের শিবিরে এসে শুনলেন— মোগল বাদশা তৈমুরলং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগমের এক পত্র পেলেন; তার এক-জায়গায় বেগম লিখেছিলেন, 'শাহেনশা, আর কেন? পদ্মিনীর আশা পরিত্যাগ করুন। হে মধুকর, তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভূমির মাঝে ফিরতে লাগলে, আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক লুটে গেল? সকলি আল্লার ইচ্ছে! আজ অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা, কাল হয়তো পথের ভিখারী! হায় রে হায়, দিল্লীর পিয়ারী বেগমকে এতদিনে বুঝি মোগল-দস্যুর বাঁদী হতে হল। বাদশা পিয়ারীর চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হলেন। বিপদ যে এত গুরুতর, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আল্লাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ শিবির উঠাতে হুকুম দিলেন। সেই রাত্রে পাঠান-ফৌজ রাজস্থান ছেড়ে কাশ্মীরের মুখে চলে গেল।

তেরো বৎসর পরে, চিতোরের সম্মুখে পাঠান-বাদশার রণডঙ্কা, আর একবার বেজে উঠল। তখন চিতোরের বড় দুরবস্থা। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে— দেশ প্রায় বীরশূন্য; নতুন নতুন লোকের হাতে যুদ্ধের ভার। রানা ভীমসিংহ সেইসব নতুন সৈন্য নতুন সেনাপতি নিয়ে গ্রামে-গ্রামে, পথে-পথে পাঠান সৈন্যকে বাধা দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল।

যুদ্ধের পর যুদ্ধে রাজপুতদের হটিয়ে দিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে-করতে একদিন আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশাহী ফৌজ চিতোরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপর গড়বন্দী তাঁবু সাজিয়ে, রাজপুতের সঙ্গে, শেষ-যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার প্রতিজ্ঞা, চিতোরের কেল্লা ভূমিসাৎ না করে দিল্লী ফেরা নয়।

মলিন মুখে রানা ভীমসিংহ চিতোর-গড়ে ফিরে এলেন। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ রাজসভায় ভীমসিংহকে ডেকে বললেন, 'কাকাজি, এত দিনে বুঝি চিতোরগড় পাঠানের হস্তগত হয়, আর উপায় নেই। প্রজা সকল হাহাকার করছে, সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই বিপদ উপস্থিত। এখন কী নিয়ে, কাকে নিয়েই বা লড়াই করি?' ভীমসিংহ বললেন, 'চিতোর এখনো বীরশূন্য হয়নি, এখনো আমরা একবৎসর পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারি, এমন ক্ষমতা রাখি।' লক্ষ্মণসিংহ ঘাড় নাড়লেন, 'কাকাজি, আর যুদ্ধ বৃথা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না করলে আর রক্ষা নেই; তবে কেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে সমস্ত দেশ-জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালাই? সমস্ত প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে! আমার ক্ষতিতে রাজ্যে যদি শান্তি আসে, যদি আগুন নিভে যায়, তবে পাঠানের সঙ্গে সন্ধি করায় ক্ষতি কী? না-হয় কিছুকাল পাঠান বাদশার একজন তালুকদার হয়েই কাটালেম।'

ভীমসিংহের দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল, তিনি মহারানার দুটি হাত ধরে বললেন, 'হায় লছমন, মনে বেশ বুঝেছি আর উপায় নেই, তবু আমার একটি অনুরোধ আছে। দুই বৎসর বয়সে যখন তোর মা গেলেন বাপ গেলেন, তখন আমিই তোকে ছেলের মতো বুকে টেনে নিয়েছিলেম; সমস্ত বিপদ-আপদ, রাজ্যের

সমস্ত ভাবনা-চিন্তা তোরই হয়ে অকাতরে সহ্য করেছিলেন। আজ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর বৎস। সাতদিন সময় দে। আমি এই শেষবার চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা দেখি! এই সাতদিন যেন পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না হয়, এই সাতদিনে যেন আমার হুকুম মহারানার হুকুম জেনে সকলে মান্য করে।'

লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'তথাস্তু।'

সেই দিন থেকে ভীমসিংহের হুকুমমতো এক-একজন রাজপুত সর্দার পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে লাগলেন।

প্রতিদিন খবর আসতে লাগল— আজ অমুক রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, আজ অমুক সামন্ত বন্দী হলেন— চিতোরের ঘরে-ঘরে হাহাকার উঠল! সেই হাহাকার, সেই হাজার-হাজার অনাথ শিশু আর বিধবার ক্রন্দন, পদ্মসরোবরের মাঝখানে, যেখানে রাজরানী পদ্মিনী শ্বেতপাথরের দেবমন্দিরে পূজায় বসেছিলেন, সেইখানে পৌঁছল! পদ্মিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পূজা সাঙ্গ করলেন। তাঁর কোমল প্রাণ সেই সব দুঃখী পরিবার অনাথ শিশুর জন্যে সারা দিন, সারা সন্ধ্যা কেবলই কাঁদতে লাগল।

ভীমসিংহ যখন মহলে এলেন তখন পদ্মিনী দুই হাত জোড় করে বললেন, 'প্রভু, আর কতদিন যুদ্ধ চলবে?' ভীমসিংহ বললেন, 'তিন দিন মাত্র। কিন্তু যুদ্ধে আর কোনো ফল নেই, রাজপুতের প্রাণে সে উৎসাহ আর নেই। এখন উপায় কী? সূর্যবংশের মহারানাকে এইবার বুঝি পাঠান-বাদশার তালুকদার হতে হল।' পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, চিতোর রক্ষার কি কোনোই উপায় নেই?' ভীমসিংহ বললেন, 'উবরদেবী যদি কৃপা করেন, তবেই রক্ষে! হায় পদ্মিনী, কার

পাপে চিতোরের এ দুর্দশা হল।' তারপর দু-একটি কথার পর ভীমসিংহ অন্য কাজে চলে গেলেন।

একা ঘরে পদ্মিনীর কানে কেবলই বাজতে লাগল— হায় পদ্মিনী, কার পাপে আজ চিতোরের এ দুর্দশা। অন্ধকারে পদ্মিনী কপালে করাঘাত করে উঠলেন; 'হায় হতভাগিনী পদ্মিনী, তোরই এ পোড়া রূপের জন্যে এ সর্বনাশ— তোরই জন্যে এ সর্বনাশ।'

নিঃশব্দ ঘরে প্রতিধ্বনিত হল— 'তোরই জন্যে এ সর্বনাশ।'

ঠিক সেই সময় চৈত্র মাসের পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বড়ো-বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে নিজের মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবরদেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন।

রাত্রি দুই প্রহর, উবরদেবীর মন্দিরে সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল একটিমাত্র প্রদীপের আলো! সেই আলোয় বসে দেবীর ভৈরবী, রাজরানী পদ্মিনীকে বললেন, 'মহারানী, আমি আবার বলি, তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার শেষ হচ্ছে মৃত্যু! দেবীর রত্ন-অলংকার একবার অঙ্গে পরলে আর নিস্তার নেই! ছয় মাসের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হতে হবে!' পদ্মিনী বললেন, 'হে মাতাজী, আশীর্বাদ করুন, যে রূপসীর জন্যে রাজস্থানে আজ এ আগুন জ্বলেছে, তার সেই পোড়া-রূপ জ্বলন্ত আগুনেই ভস্ম হোক।' ভৈরবী বললেন, তবে তাই হোক বৎসে, আমি আশীর্বাদ করি, যে চিতোরের জন্যে তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করলে, সেই চিতোরে তোমার নাম চিরদিন যেন অমর থাকে; যে মহাসতীর রত্ন-অলংকার আজ তুমি পরতে চললে, সেই মহাসতী মরণান্তে

তোমায় যেন চরণে রাখেন।' রানী পদ্মিনী ভৈরবীর হাত থেকে একটি চন্দন কাঠের কৌটায় উবরদেবীর সমস্ত রত্ন-অলংকার নিয়ে বিদায় হলেন।

সেইদিন রাত্রে প্রায় আড়াই প্রহরে চিতোরের রাজপ্রাসাদে একটুখানি সাড়াশব্দ ছিল না— মহারানা নির্জন ঘরে একা ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত প্রজা, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হবে, দেশে শান্তি আসবে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে ছিল, সেই সময়ে সমস্ত মেবারের রাজা, ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা লক্ষণসিংহের চোখে ঘুম ছিল না। হায় অদৃষ্ট! কাল সন্ধির সঙ্গে-সঙ্গে চিতোর ছেড়ে যেতে হবে, এ জীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না! রাজ্য, সম্পদ, মান, মর্যাদা, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে কোন দূরদেশে সামান্য বেশে নির্বাসনে যেতে হবে। মহারানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন— ঘরের এককোণে সোনার দীপদানে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে— একটিমাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরো যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল। মহারানা অন্তঃপুরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠল; তারপর মহারানা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নূপুরের ঝিন-ঝিন শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারানা বলে উঠলেন, 'কে তোরা? কী চাস?' চারিদিকে— দেওয়ালের ভিতর থেকে, ছাদের উপর থেকে, পায়ের নিচে থেকে শব্দ উঠল— 'ম্যায় ভুখা হুঁ!' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, আঃ, এতরাত্রে চিতোরের রাজপ্রাসাদে উপবাসে কে জাগে?' আবার শব্দ উঠল,— 'ম্যায় ভুখা হুঁ!'

তারপর গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে ওঠে তেমনই সেই শয়নঘরে অন্ধকারে এক অপরূপ দেবীমূর্তি ধীরে ধীরে উঠল। মহারানা বলে উঠলেন, 'কে তুমি, দেবতা না দানব, আমায় ছলনা করছ?' লক্ষ্মণসিংহ দীপদান থেকে সোনার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীটকুণ্ডলে, রত্ন-অলংকারে, অসংখ্য-অসংখ্য মণিমাণিক্যে হাজার-হাজার আগুনের শিকার মতো দপ-দপ করে জ্বলতে লাগল। লক্ষ্মণসিংহ দেখলেন— চিতোরেশ্বরী উবরদেবী।

ভয়-ভক্তি বিস্ময়ে মহারানার সর্বশরীর অবশ হয়ে এল— পরমানন্দে দুর্বল তাঁর হাত থেকে সোনার প্রদীপ খসে পড়ল। তারপর, সব অন্ধকার! সেই অন্ধকারে মহারানা স্বপ্ন দেখলেন, কি জেগে আছেন, বুঝতে পারলেন না। তিনি যেন সব শুনতে লাগলেন, দেবী বলছেন— 'ম্যায় ভুখা হুঁ।' বড়ো ক্ষুধা, বড়ো পিপাসা, আমি মহাবলি চাই— রক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নেই। মহারানা! ওঠো, জাগো, দেশের জন্য বুকের রক্তপাত করো— আমার খর্পর রক্তের শতধারায় পরিপূর্ণ করো! রাজা-প্রজা বালক-বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে, তবেই কল্যাণ! না হলে, সূর্যবংশের রাজপরিবার আর কখনো চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না!'

পর্বতে গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুরতে থাকে, তেমনই সেই প্রকাণ্ড ঘরে দেবীর শেষ কথা অনেকক্ষণ ধরে গম গম করতে লাগল!

রাত্রি শেষ হয়ে গেল! ঊষাকালে সোনার আলো আর শীতল বাতাসের মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অন্তর্ধান করলেন! অনেকদূরে পার্বতীমন্দিরে নহবতের সুরে ভৈরবী-রাগিনীতে মহাদেবীর স্তুতি-গান বাজতে লাগল।

প্রত্যুষে রাজদরবারে মহারানা লক্ষ্মণসিংহ যখন রাত্রের ঘটনা আর দেবীর আদেশ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করলেন, তখন সকলে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করলে না। যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল, ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল। আর যাদের প্রাণ নিরুৎসাহ, মন দুর্বল, যারা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হলে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ভেবেছিল তারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল! কিন্তু সেই রাত্রে মহারানার আদেশে মেবারের ছোটো-বড়ো সামন্ত সর্দারেরা যখন দেবীর নিজের মুখের আদেশ শোনার জন্য অন্তঃপুরে সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ রাজপুরে হাজার-হাজার রাজপুত বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবীমূর্তি 'ম্যায় ভুখা হুঁ!' বলে প্রকাশ হলেন, তখন আর কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না— সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস, সকল দুর্বলতা নিমেষের মধ্যে দূর হলো— আগুনের তেজে অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যায়! সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল; কেবল রানা ভীমসিংহ যেন সেই দেবীমূর্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে-মনে তোলা-পাড়া করতে লাগলেন— একি দেবী, না পদ্মিনী? পদ্মিনী, না দেবী?

তারপর, মহাবলির উদ্‌যোগ হল। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ তাঁর বারোটি রাজপুত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান, সবচেয়ে বড়ো রাজকুমার, যুবরাজ অরিসিংহের মাথায় চিতোরের রাজমুকুট দিয়ে বললেন, 'হে ভাগ্যবান, দেবীর আদেশ শিরোধার্য করো। পাঠান-যুদ্ধে অগ্রসর হও। আজ তুমি সমস্ত মেবারের মহারানা। এই সমস্ত সামন্ত-সর্দার তোমারই প্রজা বলে জানবে। আজ থেকে তোমারই হাতে যুদ্ধের ভার; জয় হলে তোমার পুরস্কার— ইহলোকে চিতোরের

রাজসিংহাসন; আর যুদ্ধে প্রাণ গেলে তার ফল— পরলোকে মহাদেবীর অভয়-চরণ।' বৃদ্ধ রানা লক্ষ্মণসিংহ অরিসিংহকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নিচে দাঁড়ালেন— নতুন রানার মাথায় চিতোরের কিরীট শোভা পেতে লাগল। চারিদিকে রব উঠল— 'জয় মহাদেবীর জয়! জয় অরিসিংহের জয়!' লক্ষ্মণসিংহ বলতে লাগলেন, 'সর্দারগণ, আমার আর একটি শেষ কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য দেবীর কাছে নয়, চিতোরের কাছে নয়; আমার পিতা-পিতামহ স্বর্গীয় মহারানাদের কাছে। এই মহাসমরে মেবারের রাজবংশ একেবারে নির্মূল না হয়, পরলোকে পিতৃ-পুরুষেরা যাতে জল গণ্ডুষ পান, রাজস্থানে বাপ্পার বংশ যুগে-যুগে যাতে অমর থাকে, সেই জন্যে আমার ইচ্ছা, অজয়সিংহ নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কৈলোরের নির্জন দুর্গে চলে যান।'

অজয়সিংহ মহারানার সম্মুখে জোড় হাত করে বললেন, 'পিতা, আমার এগারো ভাই চিতোরের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর আমি কিনা স্ত্রীলোকের মতো শিশু-সন্তান মানুষ করবার জন্যে বসে থাকব? আমি কি এতই দুর্বল, এমনি অক্ষম?' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, বৎস হতাশ হয়ো না, যে মহৎ কাজের ভার তোমায় দিলেম, চিতোরের যে-কোনো রাজপুত সে-ভার পেলে নিজেকে ধন্য বোধ করত! হয়তো আমাদের রক্তপাতে চিতোর উদ্ধার হবে না, হয়তো তোমাকেও চিতোরের জন্যে প্রাণপণ করতে হবে। আমরা হয়তো চিতোরকে পরাধীন রেখে চলে যাব, আর হয়তো তুমি সূর্যবংশের উপযুক্ত কোনো বীরপুরুষের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম সুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে! মনে রেখো, চিতোরের জন্যে প্রাণ দেবার যে সুখ চিতোর পুনরুদ্ধারের সুখ তার শতগুণ।' লক্ষ্মণসিংহ নীরব হলেন। জয় জয় শব্দে রাজসভা ভঙ্গ হল।

রাজসভা থেকে বিদায় নেবার সময় অরিসিংহ অজয়সিংহকে বলে গেলেন, ‘চিতোর ছেড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।’ যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করে অজয়সিংহ যখন বড়ো ভাইয়ের ঘরে গেলেন, তখন অরিসিংহ একখানি চিঠি শেষ করে ছোটো-ভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, ‘ভাই, আজ আমাদের শেষ দেখা’ কাল তুমি একদিকে, আমি একদিকে। এই শেষ দিনে তোমায় একটি কাজের ভার দিচ্ছি।’ অরিসিংহ চামড়ায়-মোড়া একটি ছোটো থলি আর সেই চিঠিখানি অজয়সিংহের হাতে দিয়ে বললেন, ‘অজয়, এ দুটি যত্ন করে রেখো, যদি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, তবে আবার চেয়ে নেব; নয় তো তুমি খুলে দেখো আমার শেষ ইচ্ছা কী।’ তারপর অজয়সিংহকে আলিঙ্গন করে অরিসিংহ বললেন, ‘চল ভাই, মায়ের কাছে বিদায় হই!’ সেইদিন শেষ-রাত্রে যখন রাজ-অন্তঃপুর থেকে দুই রাজপুত্র দুইদিকে বিদায় হয়ে গেলেন, তখন বারো ছেলের মা-জননী চিতোরের মহারানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন— তাঁর সমস্ত শরীর পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেল, কেবল সজল দুটি কাতর চোখ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল— যেদিক দিয়ে দুটি রাজকুমার চলে গেলেন। মহারানা বলতে লাগলেন, ‘প্রিয়ে, স্থির হও, ধৈর্য ধরো, বুক বাঁধো, মহাকালের কঠোর বিধান নতশিরে শান্ত-মনে বহন করো।’ তারপর রণরণ শব্দে রাজপুতের রণডঙ্কা দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে বাজতে লাগল— যুবরাজ অরিসিংহ যুদ্ধযাত্রা করলেন!

সেইদিন থেকে একমাস কেটে গেল। পাঠানের বিরুদ্ধে রাজপুতদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। একের পর এক, এগারোজন রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন।

আর আশা নেই, আর উপায় নেই। কিন্তু তবু রাজপুতের বীর-হৃদয় এখনো অটল রইল।

চিতোরের শেষ দুই বীর, লক্ষ্মণসিংহ আর ভীমসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রানার হুকুমে মেবারের লক্ষ-লক্ষ সৈন্যসামন্তের অবশেষ— ভীষণমূর্তি ভগবান একলিঙ্গের দশ-হাজার দেওয়ানী-ফৌজ একত্র হতে লাগল। তাদের একহাতে শূল, একহাতে কুঠার, দুই কানে শাঁখের কুণ্ডল, মাথায় কালো ঝুঁটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘছালের অঙ্গরাখা, পিঠে একটা করে প্রকাণ্ড ঢাল। তাদের আসবাবের মধ্যে একঘোড়া, এক কম্বল, এক লোটা— পৃথিবীতে আপনার বলবার আর কিছুই ছিল না। তারা দেবতার মধ্যে একমাত্র একলিঙ্গজীর উপাসনা করত, মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র মহারানার হুকুম মানত। সমরসিংহ এই ফৌজের সৃষ্টিকর্তা। ছোটোখাট যুদ্ধে এদের কেউ দেখতে পেত না; কেবল মাঝে-মাঝে ঘোর দুর্দিনে, যখন চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসত, যখন বিধর্মীর হাতে অপমান হবার ভয়ে দেশের যত সুন্দরী— কী কুমারী, কী বিধবা, কী দশ বছরের কচি মেয়ে, কী ষোলো বছরের পূর্ণ যুবতী— চিতার আগুনে রূপযৌবন ছাই করে দিয়ে, চিতোরেশ্বরীর সম্মুখে জীবনের শেষ ব্রত জহর-ব্রত উদ্‌যাপন করত, যখন আর কোনো আশা, কোনো উপায় নেই, সেই সময়, হতাশ রাজপুতের শেষ উৎসাহের হতো দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত এই দেওয়ানী ফৌজ চিতোরের কেল্লায় দেখা দিত! সত্তর বৎসর পূর্বে সমরসিংহের বিধবা রানী কর্মদেবী একদিন কুতুবুদ্দীনের হাত থেকে ছেলের রাজ-সিংহাসন রক্ষা করবার জন্যে মেবারের সমস্ত সৈন্য একত্র করেছিলেন; সেইদিন একবার দেওয়ানী

ফৌজের ডাক পড়েছিল, আর আজ কয় পুরুষ পরে মহারানা লক্ষ্মণসিংহের হুকুমে দেওয়ানী-ফৌজ আর একবার চিতোরের কেল্লায় উপস্থিত হল।

কালরাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগৎ-সংসার গ্রাস করেছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য যখন লুপ্ত হয়েছিল, সেই সময় চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারো-হাজার রাজপুত সুন্দরীর জহর-ব্রত আরম্ভ হল।

মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম-সুন্দরী রানী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলেন, ‘হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এসো! পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে যাক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এসো! তুমি দুর্বলের বল, সবলের সহায়। হে দেবতা, হে ভয়ংকর, আমাদের ভয় দূর করো, সন্তাপ নাশ করো, আশ্রয় দাও। লজ্জা নিবারণ, দুঃখ বিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি! পদ্মিনী নীরব হলেন। বারো-হাজার রাজপুতের মেয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে গাইতে লাগল— ‘লাজহরণ! তাপবারণ!’ হঠাৎ একসময় মহা কল্লোল চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার হাজার আগুনের শিখা মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল। বারোহাজার রাজপুতনীর সঙ্গে রানী পদ্মিনী অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন— চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক-নিমেষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল! সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর হতে চিৎকার উঠল— ‘জয় মহাসতীর জয়!’ আল্লাউদ্দীন নিজের শিবিরে শুয়ে চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখতে হুকুম পাঠালেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরের পাহাড় বেয়ে বর্ষাকালের স্রোতের মতো রাজপুত-সেনা হর-হর শব্দে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে ভয়ংকর তেজে পাঠান সৈন্যের উপর এসে পড়ল।

আল্লাউদ্দীনের তাতার সৈন্য দেওয়ানী-ফৌজের কুঠারের মুখে নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ছারখার হয়ে পলায়ন করলে। আল্লাউদ্দীন নতুন-নতুন সৈন্য এনে বারংবার রাজপুতদের বাধা দিতে লাগলেন— স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো তাঁর সমস্ত চেষ্টা প্রতিবার বিফল হল।

আল্লাউদ্দীন নিজে একজন সামান্য বীরপুরুষ ছিলেন না; এর চেয়ে ঢের কম সৈন্য নিয়ে তিনি মেবারের চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো হিন্দু রাজত্ব অনায়াসে জয় করেছেন; কিন্তু আজ যুদ্ধে রাজপুতের বীরত্ব দেখে তাঁকে ভয় পেত হল। বারো বার তিনি সৈন্য সাজিয়ে রাজপুতদের বাধা দিলেন, বারো বার তাঁকে হটে আসতে হল; আল্লাউদ্দীন বেশ বুঝলেন আজ যুদ্ধের সহজে শেষ নেই। একদিকে দিল্লীর বাদশাহীর তক্ত, আর একদিকে চিতোরের রাজসিংহাসন— কোনটা থাকে কোনটা যায়! তখন বেলা তৃতীয় প্রহর, আল্লাউদ্দীন নিজের সমস্ত ফৌজ একেবারে একসময়ে সেই বারো হাজার রাজপুত্রের দিকে চালাতে হুকুম দিলেন। নিমেষের মধ্যে পাঠান বাদশার লক্ষ-লক্ষ হাতি-ঘোড়া সেপাই-শাস্ত্রী প্রলয়-ঝড়ের মতো ধূলায়-ধূলায় চারিদিক অন্ধকার করে দীন্-দীন্ শব্দে রাজপুতের দিকে ছুটে আসতে লাগল। তারপর হঠাৎ একসময়, সমুদ্রের তরঙ্গে নদীর জল যেমন, তেমনি সেই অগণিত পাঠান সৈন্যের মাঝে কয়েক হাজার রাজপুত কোনখানে লুপ্ত হল, কিছু আর দেখা গেল না। কেবল সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে সেই যুদ্ধরত অসংখ্য সৈন্যের মাথার উপরে সূর্যমূর্তিলেখা চিতোরের রাজপতাকা একবার মাত্র

সন্ধ্যার আলোয় বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল, তারপরেই শব্দ উঠল— ‘আল্লা হো আকবর, শাহেনশা কি ফতে!’ পাঠানের পায়ের তলায় মহারানার রাজচ্ছত্র চূর্ণ হয়ে গেল! সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন; রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের উপর দলে-দলে নিশাচর পাখি কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল!

চিতোর হস্তগত হল।

পাঠানের তলোয়ার চিতোরের পথঘাট রক্তের স্রোতে রাঙা করে তুললে; ধনধান্যে, মণিমুক্তায়, লক্ষ-লক্ষ তাতার ফৌজের বড়ো-বড়ো সিন্দুক পরিপূর্ণ হল। কিন্তু যে রত্নের লোভে আল্লাউদ্দীন আজ অমরাবতীর সমান চিতোর নগর শ্মশান করে দিলেন, যার জন্যে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে বিদেশে এলেন, সেই পদ্মিনীর সন্ধান পেলেন কি?

বাদশা চিতোরে এসে প্রথমেই শুনলেন— পদ্মিনী আর নেই— চিতার আগুনে সুন্দর ফুল ছাই হয়েছে!

সেইদিন রাত্রে বাদশার হুকুমে চিতোরের ঘর-দ্বার, মন্দির মঠ— ছাইভস্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল— কেবল প্রকাণ্ড সরোবরের মাঝখানে রানী পদ্মিনীর রাজমন্দির তেমনি নতুন, তেমনি অটুট রইল! আল্লাউদ্দীন সেই রাজমন্দিরে পদ্মসরোবরের ধারে শ্বেতপাথরের বারান্দায়-ঘেরা পদ্মিনীর শয়নমন্দিরে তিনদিন বিশ্রাম করলেন। তারপর মালদেব নামে একজন রাজপুতের হাতে চিতোরের শাসনভার দিয়ে, ধীরে-ধীরে দিল্লীর মুখে চলে গেলেন। পাঠান-বাদশার প্রবল প্রতাপ, হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আর একদিকে বিস্তৃত হল। আর সেই বারো হাজার সতী-লক্ষ্মীর পবিত্র নাম বারো হাজার রাজপুত বীরের কীর্তি, চিরদিনের জন্যে, জগৎ-সংসারে ধন্য হয়ে রইল। আজও চিতোরের মহাসতীর শ্মশানে

পদ্মিনীর সেই চিতাকুণ্ড দেখা যায়; তার ভিতর মানুষে প্রবেশ করতে পারে না— এক অজগর সাপ দিবারাত্রি সেই গহ্বরের মুখে পাহারা দিচ্ছে।

হাম্বির

চিতোর তখনো পাঠানের হস্তগত হয়নি। মেবারে তখনো ভীমরানার অটুট প্রতাপ। মহারানা লক্ষ্মণসিংহের সুশাসনে দেশ যখন শান্তিতে সুখে ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, সেই সময় একদিন যুবরাজ অরিসিংহ দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। আন্ধোয়া বনের ধারে উজলা গ্রামে মেঠো রাস্তায় শিকারী দল রাজকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলেছিল— শিকার একটা ছুঁচালো-মুখ দাঁতালো বরাহ। বেলা দুপুরে মেঠো রাস্তায় অনেকখানি ধুলো উড়িয়ে অনেকদূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার রাস্তার একধারে জনার খেতের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল— সেখানে ঘোড়া চলে না, তীর তো ছোটেই না।

খেতের মাঝে মাচার উপর দাঁড়িয়ে এক রাজপুতের মেয়ে এই তামাশা দেখছিল— পরনে তার পীলা ওড়নি, নীল আঙ্গিয়া। রাজকুমারের পায়ে ছিল সবুজ দোপট্টা! দুজনের চোখ দুজনের উপর পড়েছিল। শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরিসিংহ যখন বুনাস নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, খেতের ভিতর থেকে রাজপুতের মেয়ে সেই সময় বরাহটা মেরে শিকারীদের ভেট দিয়ে গেল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ক্যায়সে মারা!’

বালিকা বল্লমের মতো সিধে একটা জনারের শিষ দেখিয়ে বললে— ‘ইসিসে ঘায়েল কিয়া।’ তার ধুলোমাখা কালো চুলগুলি সাপের ফনার মতো সুন্দর মুখের চারিদিকে বড় শোভা ধরেছিল। তার সুডোল হাতে পিতলের কাঁকন সূর্যের আলোয় সোনার মতো কেমন ঝকঝক করছিল। বুনাস নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কথাই ভাবতে ভাবতে রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল।

সবুজ খেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখি আর ছাগল তাড়াতে-তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কিনা কে জানে; কিন্তু এক সময় তার হাত থেকে ঠিকরে একটা মাটির ঢেলা সেই আমবাগানের ধারে ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল! হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চমকে উঠে রাজকুমার চেয়ে দেখলেন আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ খেত— তারই মাঝে সেই নীল-আঙ্গিয়া, পীলা-ওড়নি কৃষকনন্দিনী!

পশ্চিম বাতাসে অড়রের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, একদল টিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা-শেষে দিনের আলো নিবু-নিবু, পাথরের মতো পরিষ্কার আকাশ, তার কালো মেঘের সরু রেখা— রাজকুমার শিকার শেষে বাড়ি চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেখানেই আবার দুজনে দেখা হলো— বালিকা মাথায় দুধের কলসী নিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে চলেছে— সঙ্গে দুটি চিকন কালো ছানা ভৈঁষ!

পরদিন উজলা গ্রামের সেই বালিকার ঘরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজকুমারের দূত এল! বালিকার পিতা চন্দাসো বংশের চৌহান রাজপুত কিছুতেই গেহলোট বংশে কন্যাদানে সম্মত নয়— রাজকুমার হতাশ হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ঘরে গৃহিণীর কাছে পাড়াপড়শীর দুয়ারে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা-পরিসীমা রইল না। এমন কাজও করে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? যেমন বুদ্ধি, তেমনি চিরটা কাল চাষ হয়েই থাক।

বুড়ো কিন্তু সকলের কথায় একই জবাব দিত, ‘তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু লছমীকে কখনোই রাজবাড়িতে পাঁচ সতীনের দাসী করে দিতে পারিনে; তার চেয়ে আমার মেয়ে গরিবের ঘরে গিন্নী হয়ে থাক সেও ভালো।’

কিন্তু বুড়োর প্রতিজ্ঞা বেশিদিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, পদ্মিনী রানী লিখছেন: 'আমি নিঃসন্তান, তোমার কন্যাকে ভিক্ষা চাই; আমার আশীর্বাদে চিতোরের রাজলক্ষ্মী তোমার বংশকে বরণ করুন।'

সতীর কথা ব্যর্থ হয় না। লছমীর সন্তান যে চিতোরের সিংহাসনে বসবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। ধূমে-ধামে আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে বর-বেশে যুবরাজ এলেন যেন কোনো স্বপ্নের রাজ্য থেকে। রাজপুত্র এসে উজলাগ্রামে উদয় হলেন— আনন্দে, আলোয়, নাচে-গানে সমস্ত গ্রাম এক রাতের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুখের বাসর আনন্দের মধ্যে কখন কাটল বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমীরানীকে আর এক-মাসের শিশু রাজপুত্র হাম্বিরকে উজলাগ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। সে-যুদ্ধে যে গেল তাকে আর ফিরতে হল না। রানা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীমসিংহ গেলেন, রানী পদ্মিনী, রাজবধূ, রাজমাতা, সকলে গেলেন। চিতোর লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। রইলেন কেবল উজলাগ্রামে হাম্বিরকে নিয়ে রানী লছমী, আর কৈলাসের কেল্লায় মেবারের রানার বংশধর অজয়সিংহ।

একদিকে শোরোনাল বলে একখানি ছোটো গ্রাম, আর একদিকে আরাবল্লী পর্বত, মাঝে একটি ছোটো পাহাড়ের উপর কৈলোরের পুরাতন কেল্লা। এক সময়ে পাহাড়ী ভীলদের শাসনে রাখার জন্যে ওই কেল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তখন চিতোরের মহারানা বছরের মধ্যে প্রায় চারমাস এখানেই কাটাতেন। তখন কেল্লার শ্রী-ই ছিল এক। তারপর পাহাড়ী জাত যখন ক্রমে অধীন হয়ে শত্রুতা ছেড়ে বশত্যা মানলে তখন আর বড়ো একটা এখানে আসবার প্রয়োজন হত না।

ক্বচিৎ দুই একজন রাজকুমার শিকারে এসে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেল্লাও ক্রমে ভেঙে-চুরে বন-জঙ্গল আর কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের মাঝে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহের বংশধর রাজ্যহারা অজয়সিংহ স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে একদিন এই কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। সে দুঃখের রাত কী দুঃখে কেটেছিল কে বলবে! মাথার উপরে ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ছে, ঘরের কোণে ইন্দুরের খুটখাট, বাদুড়ের ঝটাপট— রাজার ছেলে রাজার বৌ তারই মাঝে ভিজে ঘরে খড়ের বিছানায় ঘোড়ার কম্বল ঢাকা দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে গ্রামবাসীরা রাজা দেখতে এসে দেখলে তাদের রাজার বসবার সিংহাসন, শোবার খাটিয়া নেই; রাজার রানী, রাজার ছেলে ঘোড়ার কম্বলে বসে আছেন। মেবারের রানা অজয়সিংহ আজ কোথায় সোনার সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়ে বসবেন, রানীমা কোথায় দুই রাজকুমার অজিমসিংহ সুজনসিংহকে নিয়ে গজদন্তের পালঙ্কে আরাম করবেন, না তাঁদের এ দুর্দশা? গ্রামবাসীরা তখনই যত্ন করে কেল্লা পরিষ্কার করতে লাগল, ঘর সাজাতে লাগল, গ্রামের জোতদার গজদন্তের খাট সিংহাসন, কিংখাবের সুজনী, জরীর চাঁদোয়া, শ্বেত চামর, চন্দনের পাখা, রূপার প্রদীপ, সোনার বাটা শ্বেত পাথরের বাসন হাজির করলে। খেত থেকে চাষীর মেয়েরা তরি-তরকারি, ঘিয়ের মট্‌কি, দুধ দেবার গাই, ঘোড়ার ঘাস নিয়ে হাজির হল। দেখতে-দেখতে সাজ-সরঞ্জাম কেল্লার শ্রী ফিরে গেল। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী তাদের রাজার মুখে, রানীর মুখে, দুই রাজ-পুত্রের মুখে হাসি দেখে বিদায় হল।

ভক্ত প্রজার প্রাণপণ সেবায় অজয়সিংহ সব দুঃখ ভুললেন, কেবল চিতোর যে এখনো পাঠানের হস্তগত এ দুঃখ তাঁর মন থেকে কিছুতে গেল না।

তিনি প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'হায়! সূর্য এখনো রাহুগ্রস্ত, কবে এ গ্রহণ শেষ হবে তা কে জানে! সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করে আমায় কতকাল থাকতে হবে কে বলতে পারে।'

দিন যেতে লাগল। কিন্তু যে সুদিনের প্রতীক্ষায় অজয়সিংহ রইলেন, সে সুদিন বুঝিবা আর এল না। পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করতে অজয়সিংহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর লোকবল অর্থবল কোথায়? বড়ো আশা ছিল দুই রাজকুমার অজিমসিংহ সুজনসিংহ বড়ো হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে— কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধলেন। সেদিন বর্ষাকাল, মেঘের ঘটা আরাবল্লী পর্বতের শিখরে কাজলের মতো ছায়া ফেলেছে। গ্রামের উপর খেতের উপর দিয়ে আলো-আঁধারের খেলা চলেছে। দুই রাজকুমার শিকারে বেরিয়েছেন, রাজা-রানীতে মহলের ভিতর একলা আছেন।

সন্ধ্যা হল— রাজকুমারেরা ঘরে ফিরছেন না, রানীমা এক-একবার খোলা জানলায় ছেয়ে দেখছেন। দেখতে-দেখতে পশ্চিম মেঘের তীরে একটু-খানি সোনার ঢেউ খেলিয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রির অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে এল। রানীমা রাজার সঙ্গে কথা বলছেন আর বারে-বারে জানালার পানে চেয়ে দেখছেন।

রাজা বললেন, 'তোমায় আজ আনমনা দেখছি যে?'

'কে জানে প্রাণটা কেমন করছে', বলে রানীমা উঠে গেলেন। দাসী ঘরে এসে প্রদীপ দিয়ে গেল। টুপটাপ করে ক্রমে বড়ো-বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

রানীমা মলিন মুখে ফিরে এসে বললেন, 'এরা যে দুভায়ে সকাল থেকে শিকারে গেল, এখনো এল না কেন?'

রানা বলে উঠলেন, 'সে কী? এখনো এরা ফেরেনি? এই ঝড়-বৃষ্টিতে দুজনে কোথায় রইল?' বলতে-বলতে কেল্লার উঠানে লোকের কোলাহল শোনা গেল। তখন মেঘ কেটে গিয়ে চন্দ্রোদয় হচ্ছে; রাজা রানী দেখলেন জন কয়েক গ্রামবাসী কাকে যেন ধরা-ধরি করে নিয়ে আসছে। একজন দাসী তাড়াতাড়ি এসে খবর দিয়ে গেল, 'রানীমা, দেখুন গিয়ে বড়োকুমার অজিম বাহাদুরের কী হয়েছে।' বলতে-বলতে লোকজন ধরাধরি করে রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাজা রানী শুনলেন, পাহাড়ের উপর শিকার করতে গিয়ে মুঞ্জ বলে যে ভীল সর্দার, তার ছেলের সঙ্গে সুজন বাহাদুরের হরিণ নিয়ে ঝগড়া হয়, ক্রমে লড়াই বাধে। বড়োকুমার তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন।

রানা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর সুজন সিং কোথায় গেলেন।'

লোকজনেরা মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে তিনি ভালো আছেন, আমাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে একটা চটিতে বিশ্রাম করছেন, এলেন বলে!'

পথের ধারে চটিতে বিশ্রাম করার মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে আড্ডা দেওয়া। রানা বুঝলেন; বুঝেই বললেন, 'বিপদের সময় বিশ্রাম না করলেই নয়!'

লোকজন সকলে বিদায় হল। রাজা রানী রাজবৈদ্য আর দু-একজন দাসী অচৈতন্য অজিমকে ঘিরে রইলেন। সমস্ত রাত্রে রাজকুমারের চেতনা হল না। রাজবৈদ্য ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আঘাত সাংঘাতিক।' ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার একবার চোখ চাইলেন, একবার 'মা' বলে ডাকলেন; তারপর ভাঙা খাঁচা ছেড়ে পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনি রাজকুমারের সেই সোনার দেহ ছেড়ে প্রাণ-পাখি চলে গেল। তারপর দিনের পর দিন কাটতে লাগল। অজয়সিংহ শোকে

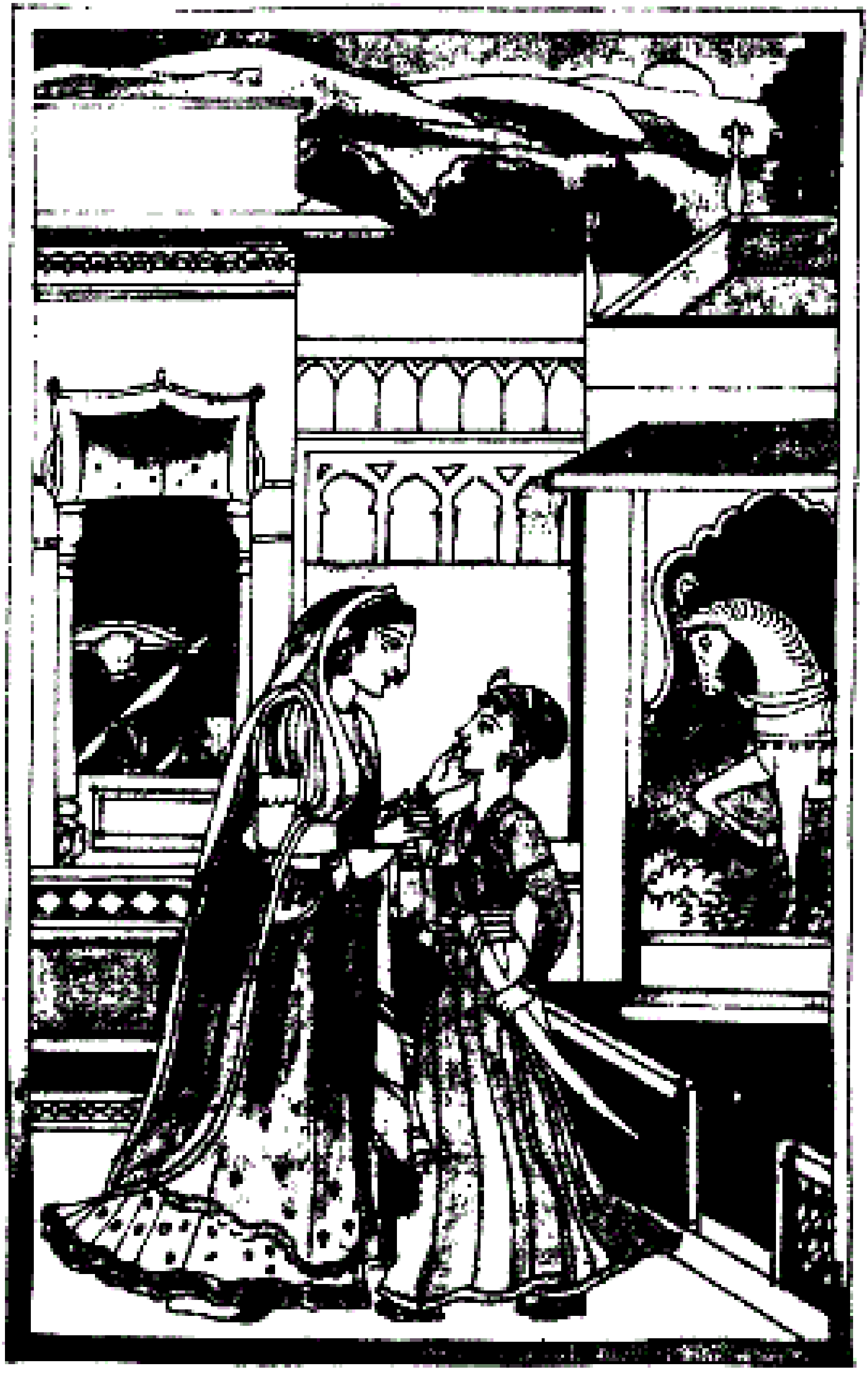

দুঃখে নিরাশায় দিন-দিন ম্রিয়মাণ হতে লাগলেন। আর সেই দুর্দান্ত মুঞ্জ ডাকাত দিন-দিন প্রবল হয়ে গ্রামবাসীদের উপর প্রজালোকের ঘরে বিষম উৎপাত আরম্ভ করলে। এমনকি দূরন্ত ডাকাত্ এসে একদিন কৈলোরের কেল্লা পর্যন্ত লুট করে গেল। ডাকাত অজয়সিংহের মুকুট কেড়ে নিয়ে তাঁর মাথায় তলোয়ারের চোট মেরে চলে গেল। বৃদ্ধ অজয়সিংহ, নেশাখোর সুজন বাহাদুর— প্রজালোককে কে রক্ষা করে? একদিকে পাঠানের উৎপাত আর একদিকে মুঞ্জ ডাকাতের নিষ্ঠুর অত্যাচার। ওদিকে আবার চারিদিকে খবর হল— রানা আর বেশিদিন বাঁচেন কিনা সন্দেহ। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সকলেই বলতে লাগল এতদিনে বুঝি সূর্যবংশের গৌরব শেষ হয়। সুজন বাহাদুর যে রাজ্য চালাতে পারেন, এমন তো বোধ হয় না।

রাজ্যের যখন এই দুরবস্থা সেই সময় উজলাগ্রাম থেকে লছমীরানী হাম্বিরকে নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হলেন। রানার আত্মীয়-স্বজন দেশের সর্দার সামন্ত যে যেখানে ছিলেন উপস্থিত। রানা সকালে সভা করে বসেছেন, হাম্বির এসে প্রণাম করলেন। রানা আশীর্বাদ করে হাম্বিরকে কাছে বসালেন। হাম্বিরকে দেখে আজ তাঁর দাদা অরিসিংহকে মনে হল। সেই নাক সেই চোখ; দাদার মতো তেমনি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গলার স্বর তেমনি মধুর গম্ভীর। আজ অজয়সিংহের মনে পড়ল তাঁর দাদা অরিসিংহ পাঠানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর হাতে একখানি চামড়ার থলি আর একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চিঠিতে আমার শেষ ইচ্ছা রইল। আর এই থলিতে একখানি ছোরা রইল, হাম্বির বড়ো হলে এ দুটি তাকে দিও।'

রানা অজয় আজ তাঁর সমস্ত সামন্ত-সর্দারের সম্মুখে অরিসিংহের নিজের হাতের ছোরা আর মোহর-করা সেই চিঠি হাম্বিরের হাতে দিয়ে বললেন, 'বৎস, পড়ে দেখো, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা কী।' পত্রে লেখা ছিল—

শ্রীরাম জয়তি

শ্রীগণেশ প্রসাদ শ্রীকলিঙ্ক প্রসাদ

মহারাজ অধিরাজ শ্রী অরিসিংহ আদেশতু

অতঃপর অজয়সিংহজী ও মেবারের দশ সহস্র অধিকারের সামন্ত-সর্দার ও জনপদবর্গকে আমার আদেশ এই যে— ভবানী মাতার ইচ্ছায় পাঠান যুদ্ধ সংকট সমরে যদি আমার স্বর্গলাভ ঘটে, তবে দেশাচার মতো ভাইজী অজয়সিংহ একলিঙ্গজীর দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত প্রজাপালন ও রাজ্যচালনা করিতে থাকিবেন ও আমার বিধবা পত্নী রানী লছমীও শিশুপুত্র হাম্বিরকে লইয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে উজালাগ্রামে বাস করিতে পারেন সেজন্য উজলাগ্রাম ও তাহার সংলগ্ন সমুদয় জমি-জমা রানীর নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমি নিজ বুদ্ধি ও বিশ্বাসমতো দেওয়ানীর বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, কিন্তু ইতঃপর সিংহাসন লইয়া হাম্বির ও ভাইজীর সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে নিমিত্ত শেষ অনুরোধ এই যে, আমাদের সামন্ত-সর্দার-মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজালোক যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনায় দেওয়ানীতে বহাল করিবেন তিনিই রাজ্যাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। হাম্বির ও অন্যান্য কুমারের প্রতি আমার এই আদেশ যে তাঁহারা এই উত্তরাধিকার-সূত্র লইয়া বিবাদ না করেন। দেশের সংকট অবস্থা— এ সময়ে গৃহ-বিবাদ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে কুসন্তান এই গৃহবিবাদে লিপ্ত হইবে,

ভগবান একলিঙ্গের অভিশাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করে। ইতি সংবৎ ১৩৩৩ চিতৈরগড়।

পত্র পাঠ শেষ হলে রানা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, ‘এখন কী করা কর্তব্য! রাজ্যের সমস্ত সামন্ত-সর্দারই উপস্থিত আছেন; আমার ইচ্ছা, এই সভাতেই সিংহাসন সুজন বাহাদুরের কি হাম্বিরের এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হোক। আমি বুঝেছি, আমি আর অধিক দিন নয়; অতএব আমি বেঁচে থাকতেই উপযুক্ত কোনো এক কুমারের হাতে দেওয়ানীর ভার দিতে চাই। এখন দুই কুমারের মধ্যে কে উপযুক্ত তোমরা সকলে স্থির করো।’

রাজসভায় তুমুল তর্ক উঠল। সেই সময় পেটমোটা, নেশায় ঢুলু-ঢুলু রক্তচক্ষু সুজনসিংহ সভায় প্রবেশ করলেন। সভায় দুইদল হল। একদল বললেন সুজন বাহাদুরেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত, কেননা রাজ্য চালাতে বাহুবলের প্রয়োজন, এবং বাহুবলটা যে সুজন বাহাদুরের যথেষ্ট আছে সেটা সকলেই জানে। অন্যদল বলে উঠল, শুধু কি বাহুবলের কর্ম। রাজ্য চালাতে হলে ধৈর্য চাই, বুদ্ধি চাই, সুজন বাহাদুরের এ দুটোর একটাও নেই। সৈন্যই রাজার বল, রাজাকে যদি নিজেই লড়াই করতে হল তবে আমরা আছি কী করতে? আমরা তো বলি হাম্বিরকেই রাজা করা উচিত। অন্যদল বলে উঠল, বাপুহে, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকলে আর চলছে না; এখন রীতিমতো লড়াই করতে হবে। আমরা এমন রাজা চাই, যে একাই একশো পাঠান ঠেকাতে পারে। দুইদলে প্রচণ্ড তর্ক, শেষে হাতাহাতি হবার যোগাড়।

অজয়সিংহ বললেন, ‘তোমরা স্থির হও, আমি যা বলি শোনো। তোমরা তো জানো ভীল-সর্দার মুঞ্জ সেদিন কেল্লা লুট করে গেছে, আমাদের সাধ্য হয়নি

যে তাদের বাধা দিই। সেই রাত্রে ডাকাত এই কেল্লা থেকে চিতোরের রাজমুকুট নিয়ে পলায়ন করেছে; শুধু তাই নয়, আমি সংবাদ পেয়েছি সে নাকি আবার সেই রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজেকে রাজস্থানের রাজা বলে প্রচার করছে। সূর্যবংশের এই ঘোর অপমানের একমাত্র প্রতিকার, সেই রাজমুকুট উদ্ধার করা। হাম্বির আর সুজন দুইজনেই এখন উপযুক্ত। দুইজনের মধ্যে যিনি সেই পাপাত্মার মুণ্ড সমেত মুকুট উদ্ধার করতে পারেন তিনিই রাজ্যের অধিকারী হউন। কৃতঘ্ন ভীল যে মাথায় মেবারের রাজমুকুট ধারণ করতে সাহসী হয়েছে, সে মাথা শীঘ্র আমি চাই, নচেৎ আমার জীবনে মরণেও শান্তি নেই। মেবারের দুই উপযুক্ত রাজকুমার বর্তমান থাকতে যদি সে মুকুট উদ্ধার না হয়, তবে জানলেম মেবারের সূর্যবংশ আজ নির্বংশ হয়েছে; রাজ্যে বীর নেই, রাজসিংহাসন ভীল আর পাঠানের পাওয়াই শ্রেয়। কেল্লার যত সৈন্য যত অস্ত্র আছে, দুই কুমার ইচ্ছামতো ব্যবহার করুন। আজ সভা ভঙ্গ করো।' কোলাহলে রাজসভা ভঙ্গ হলো।

তার পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বন্ধু-বান্ধব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে চললেন। আজ তিনি ভারি ব্যস্ত। অন্যদিন বেলা এগারোটার পূর্বে সুজন বাহাদুরের ঘুম ছাড়ত না, আজ তিনি ভোর না হতেই প্রস্তুত। এত ব্যস্ত যে হাম্বিরকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে যান তারও সময় হল না। কেল্লার জনপ্রাণী না উঠতে-উঠতে বড়োকুমার সুজনসিংহ দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দু-একজন সামন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, ছোটো রাজকুমার গেলেন না।'

সুজনসিংহ হেসে বললেন, 'তিনি একটু আরাম করছেন। চলো আমরা আগে যাই, তিনি আহারাদি করে পরে আসবেন এখন।'

অমনি একজন খোশামুদে রাজপারিষদ বলে উঠল, ‘চলুন আমরা আগে তো গিয়ে ডাকাতের বাসা ঘেরাও করি, পরে না হয় ছোটো কুমার এসে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবেন।’ অন্যজন বা বললে, ‘হুঁঃ, রানার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। একি যার তার কর্ম? বুকের পাটা চাই। ডাকাত বলে ডাকাত— মঞ্জু ডাকাত! নামে যার দেশশুদ্ধ থরহরি কম্প, তাকে ধরতে কিনা ছোটোকুমার! হাতি মারতে পতঙ্গ!’ ওর মধ্যে কোনো এক মন্ত্রীপুত্র বলে উঠল, ‘না হে না, রাজবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কি তোমাদের কর্ম! কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার, বুঝলে কিনা।’

সুজনসিংহ হেসে বললেন, ‘না হে না, তোমরা জানো না, হাম্বিরের গায়ে বেশ শক্তি আছে। তবে কী জানো, ছেলেমানুষ, এখনো হাড় পাকেনি। আমি এবার লড়াই থেকে এসেই তাকে রীতিমতো কুস্তি শেখাবার বন্দোবস্ত করছি, দেখো না!’

এদিকে সকালে উঠে হাম্বির একখানা পুরোনো তলোয়ার আর একখানা ছোরা শান্-পাথরে ঘষে-ঘষে সাফ করছিলেন। ছোরাখানা পিতা অরিসিংহের, আর তলোয়ারখানা উজলাগ্রামের দাদামশায় হাম্বিরকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কতকাল পরে শান্ পেয়ে অস্তর দুখানা বর্ষার জল পেয়ে নদীর স্রোতের মতো ক্রমে খরধার হয়ে উঠল। হাম্বির বসে-বসে অস্তরে শান্ দিচ্ছেন, এমন সময় লছমীরানী সেখানে এসে বললেন, ‘এখানে বসে কী করছিস?’

হাম্বির বললেন, ‘জানো না মা? ডাকাত ধরতে যেতে হবে, তাই অস্তর দুখানায় শান্ দিচ্ছি।’

লছমীরানী বললেন, 'হা কপাল! তুমি এখনো অস্তর শান্ দিচ্ছ, আর ওদিকে যে সুজন সিং সৈন্যসামন্ত নিয়ে ডাকাত ধরতে গেল। তোর চেয়ে তো সে কাজের লোক দেখি, লোকে কেবল তার মিছে দুর্নাম রটায় বুঝলেম।'

হাম্বির যেন মায়ের কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তাই তো মা, দাদা তো আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন না? রাজত্বিটা দেখছি আমার কপালে নেই। যাই হোক, আমি ছাড়চিনে।'

এই কথা বলে হাম্বির দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ার শান্ দিতে লাগলেন। রানীমা বললেন, 'যা যা, বেলা হল— এখন কিছু খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ এ দুখানায় শান্ দিচ্ছি।' হাম্বির উঠে গেলেন, লছমীরানী বসে-বসে অস্তরে শান্ দিতে লাগলেন। রাজপুতের মেয়ে বাটনা বাটা কুটনো কোটার চেয়ে অস্তরে শান্ দেওয়া ভালো বোঝেন। তাঁর হাতে পড়ে অস্তর দুখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই চকচকে ঝকঝকে হয়ে উঠল। হাম্বির ফিরে এলে রানীমা তাঁর হাতে ছোরাখানা দিয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, এটায় যেন ফাট ধরেছে বোধ হয়। আঁকা-বাঁকা যেন কিসের দাগ দেখছি। এখানায় তো কোনো কাজই হবে না।

হাম্বির বললেন, 'বলো কী মা, বাবার হাতের ছোরা কাজে লাগবে না কী? দাও দেখি একবার ভালো করে দেখি।' হাম্বির ছোরাখানা নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বোঝা গেল না। মনে হলো যেন ছোরার ফলকটার একদিক থেকে আর একদিক জুড়ে একটা আঁকা-বাঁকা ফাট। ফাট কি রক্তের দাগ চেনা যায় না।

হাম্বির বললেন, ‘তাই তো, ‘এটা তো কিছু বোঝা গেল না; ভালো করে দেখতে হবে। মা তুমি অস্তর দুখানা আমার ঘরে রেখে দিও। আমি একবার মহারাজার সঙ্গে দেখা করে আসি, একটা ভালো ঘোড়া দেখে নিতে হবে।

অজয়সিংহ আজ আর সভায় যাননি। শরীর অসুস্থ, নিজের মহলে বিশ্রাম করছিলেন, হাম্বিরকে আসতে দেখে বললেন, ‘সে কী, তুমি যাওনি? সুজন তো অনেকক্ষণ রওনা হয়েছেন!’

হাম্বির বললেন, ‘আজ্ঞে, একটি ঘোড়া বেছে নিতে কিছু বিলম্ব হবে, আমি আজ সন্ধ্যাকালেই রওনা হব।’

অজয়সিংহ বললেন, ‘লোকজন তো সব বড়ো কুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তুমি একা পথ চিনবে, কেমন করে?’

হাম্বির বললেন, ‘আজ্ঞে, একজন শিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে-ই আমাকে ডাকাতের আড্ডা দেখিয়ে দেবে। আমি মনে করেছিলুম, লোকজন নিয়েই যাব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, মুঞ্জ ভীল যে রকম দুর্দান্ত, তার সঙ্গে লোকজন নিয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। কৌশল কার্যসিদ্ধ করা চাই।’

অজয়সিংহ বললেন, ‘যা ভালো বোঝো তাই করো। আশীর্বাদ করি জয়ী হও।’ হাম্বির প্রণাম করে বিদায় হলেন।

হাম্বির নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, লছমীরানী এসে বললেন, ‘কই তোর যাবার কী হল? তোর তো লড়ায়ে যাবার কোনো চেষ্টাই নেই দেখছি। ভয় পেলি নাকি? এই যে বললি, ঘোড়া ঠিক করতে যাচ্ছি, আর ঘরে বসে ঘুম দিচ্ছিস।’

হাম্বির একটুখানি হেসে বললেন, ‘বোসো মা, ডাকাত ধরতে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? একটু ভেবে নিতে দাও, ফন্দি আঁটতে দাও। একি বুনো শুয়োর, যে যাব আর জনাবের শিষে গেঁথে আনব।’

লছমীরানী বুঝলেন, হাম্বির মুখে তামাশা করছেন, কিন্তু মনে-মনে যেন কী একটা মতলব স্থির করে বসে আছেন। তিনি হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, ‘বটে, আমার সঙ্গে তামাশা হচ্ছে? একটা জনাবের শিষ দিয়ে বুনো শুয়োর গেঁথে আন, তবে বাহাদুর বুঝি। দেখা যাবে তোমার ঐ পুরোনো তলোয়ার আর দাগী ছোরায় কতদূর কী করো! এখন বল দেখি তোর মতলব কী?’ তারপর মায়েতে ছেলেতে সেই নির্জন ঘরে সারাদিন কত কী পরামর্শ হল। সন্ধ্যা হয়-হয়, রানী লছমী বললেন, ‘তুই তবে প্রস্তুত হ— আর বিলম্ব করলে রাত্রি হয়ে পড়বে।’

হাম্বির বললেন, ‘আর প্রস্তুত কী, এই যেমন আছি, তেমনিই যাব। দেখো তো মা আমার ঘোড়াটা এল কিনা।’

রানী উঠে গেলেন। হাম্বিরের ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে এল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ‘দেখা যাক মা, পুরোনো তলোয়ার, দাগী ছোরা আর এই বেতো ঘোড়াটা নিয়ে কতদূর কী করতে পারি।’

মা আশীর্বাদ করলেন, ‘জয়ী হও।’

হাম্বির সেকেলে তলোয়ার কোমরে গুঁজে সামান্য বেশে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এল। সূর্য অস্ত গেলেন। হাম্বিরকে নিয়ে সেই বেতো ঘোড়া খটর্-খটর করে গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে প্রবেশ করলে।

আরাবল্লী পর্বতের নিবিড় বনচ্ছায়ায় ঘোর অন্ধকার। দুহাত তফাতে লোক চেনা যায় না। হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়াটাকে একদিকে ছেড়ে দিয়ে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সেই বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন। ছায়ার সঙ্গে যেন একটা ছায়া মিলিয়ে গেল। যেমন শিকারের সন্ধানে বাঘ ফেরে, তেমনি সেই অন্ধকার বনে হাম্বির নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে গিরি-নদীর পারে-পারে, ঘনবনের ধারে-ধারে, পাহাড়ের গহ্বরে-গহ্বরে ডাকাতের সন্ধান করে চললেন। তৃষ্ণার সময় নদীর জল, ক্ষুধার সময় গাছের ফল, ঘুমের সময় পর্বতের গহ্বর, এমনি করে হাম্বিরের দিন কেটে চলল। যেসব মহাবনে মানুষের চলাচল নেই— দিবারাত্রি যেখানে কেবল সবুজ অন্ধকার আর বাঘ-ভালুকের গর্জনে পরিপূর্ণ, দিনের পর দিন হাম্বির সেই সব মহাবনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; বনের আর অন্ত নেই।

একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি— বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শালগাছে চড়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছেন আর মনে-মনে ভাবছেন, দূর কর ছাই, ডাকাতের সন্ধান কি পাওয়া যাবে না? আজ তো এই অন্ধকারে আর পথ চলা অসম্ভব। আজ রাত্রি দেখছি এই গাছেই কাটাতে হল। উঃ, বনের তলায় মশাগুলো ভনভন করে ডাকছে দেখো। আবার ঐ যে বাঘের গর্জন, ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। এত মশার ভনভনানি আর বাঘের গর্জন কোনো দিন তো শুনিনি। যাই হোক আজ রাত্রিতে আর মাটিতে পা দেওয়া নয়। এ বনটায় তত গাছপালা নেই কিন্তু জীবজন্তু দেখছি অনেক আছে। হাম্বির নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন।

অনেক রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙল। হাম্বির দেখলেন আকাশের একদিকে রাঙা আলো দেখা দিয়েছে। সকাল হয়েছে ভেবে হাম্বির উঠে বসলেন; কিন্তু সকাল হল তো পাখি ডাকে না কেন? তবে ভ্রম হল নাকি? হাম্বির বেশ করে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। সেই সময় যেন দুজন মানুষে সেই শালগাছের তলায় কথা কইছে শোনা গেল। লোক দুটোর কথা বোঝা গেল না কিন্তু দু-একবার মুঞ্জ ডাকাতের আর সুজন বাহাদুরের নাম বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

হাম্বির আস্তে-আস্তে গাছের ডাল বেয়ে খানিকটা নেমে এসে কান পেতে শুনতে লাগলেন, দুই পাহাড়ীতে কথা হচ্ছে, 'ওরে ভাই বদরী, তুই এখনো মঞ্জু-মঞ্জু বলিস, তাই তো সে চটে যায়।'

মঞ্জুকে মুঞ্জু বলব না তো কী? সে কি জানে না যে আমি তার চাচা হলেম?'

'ওরে ভাই, সে কি এখনো চাচা-ফাচা মানে? যে দিন থেকে সে সেই রাজপুতগুলোকে আর রানার ছেলেকে লড়ায়ে হারিয়ে দিয়েছে, সেদিন থেকে তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে এখন চায় আমরা তাকে রানা আর তার ছেলেকে কুমার বলি।'

'রেখে দে তোর রানা, রেখে দে তোর কুমার। আমি তাদের চিরকাল বলব মুঞ্জ আর ভুঞ্জ।'

'তবে ভাই রঞ্জু, আজ তুই লাচ দেখতে চলেছিস কেন? সর্দার আজ মেয়ের বিয়েতে মৌয়া খেয়ে নেশা করেছে— তোকে দেখলেই মাথা কাটতে আসবে।'

'ওরে একি বলিদানের মোষ পেয়েছিস যে টক করে হাড়িকাঠে মাথা দেব? চল এখন নাতনির বিয়েতে একটু আমোদ করা যাক; বাজে কথায় কেবল রাত কাটালি।'

লোক দুটো হন-হন করে উত্তর-মুখো চলল। হাম্বির এতক্ষণে বুঝলেন, তিনি ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছেন। দূর থেকে মাদল আর ঝাঁঝরের হুমহুম ঝুমঝুম আওয়াজ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মশালের আলো আকাশের একদিক রাঙা করে তুলেছে। হাম্বির তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সেই লোক দুটোর সঙ্গ নিলেন।

কতদিন কেটে গেছে সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে না পেরে কৈলোরের কেল্লায় ফিরে এসেছেন। হাম্বিরের কিন্তু কোনো খবর নেই। সকলেই বলছে, নিশ্চয় তিনি ডাকাতের হাতে কাটা পড়েছেন। এমন সময় একদিন মহারানার সভায় হাম্বিরের এক পত্র এল। হাম্বির উজলাগ্রাম থেকে লিখেছেন— তিনি উজলাগ্রামে মুঞ্জ বাহাদুরকে মেবারের রানা করে রাজসিংহাসন দিয়েছেন। নতুন রানা হাম্বিরকে কৈলোরের কেল্লা আর একশোখানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছেন। অজয়সিংহ যদি সহজে কেল্লা ছেড়ে দেন তো ভালো, নচেৎ লড়াই নিশ্চয়। এবং মুঞ্জ বাহাদুর সশরীরে সগণে এসে কেল্লা দখল করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

শুনে সুজনসিংহ বলে উঠলেন, 'দেখলে, ছোকরার কাণ্ডটা দেখলে একবার। সে কি মনে করেছে, দুমুঠো ডাকাতের দল নিয়ে মেবারের সিংহাসন দখল করবে? এত বড়ো তার স্পর্ধা।'

অজয়সিংহ বললেন, 'হাম্বির কি এতদূর নিচ হবে? এ তো আমার বিশ্বাস হয় না। চিঠিটা কেমন কেমন শোনাচ্ছে না?'

রাজমন্ত্রী বললেন, 'কথাটা যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু বলাও যায় না। আমার মনে হয় প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভালো। আজকালের ছেলে কখন কী করে বসে বলা যায় না।'

সুজনসিংহ বললেন, 'তবে একবার মেবারের সমস্ত সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠানো হোক।'

অজয়সিংহ বললেন, তাতে কাজ নেই। এ কী পাঠান বাদশা আসছে, যে সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠাতে হবে? লোকে যে হাসবে! সকলকে সাবধানে থাকতে বলো। হঠাৎ কেল্লায় ডাকাতি না হয়। হাম্বিরকে লিখে দাও যেন এমন দুঃসাহসের কাজ না করে। আর একদল সৈন্য নিয়ে তুমি উজলাগ্রাম থেকে ডাকাতের দল তাড়িয়ে দাও গে; আর পারো তো হাম্বিরকে বেঁধে আনো।'

সুজনসিংহ 'যে আজ্ঞে' বলে উঠে গেলেন। কিন্তু তিনি মুঞ্জ ডাকাতের হাতে একবার পড়েছিলেন। সে যে কেমন সহজ ডাকাত, বেশ চিনেছেন। ঘরে গিয়ে রাজবৈদ্যকে দিয়ে মহারানাকে বলে পাঠালেন, শরীর তাঁর বড়ো অসুস্থ; কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হয়। ডাকাত ধরতে সেনাপতিকে পাঠালে চলে না?

অজয়সিংহ বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে।'

সেদিন রাত্রে অজয়সিংহ লছমীরানীর সঙ্গে দেখা করে হাম্বিরের পত্র দেখালেন। রানীমার অন্দর-মহলে সেনাপতির তলব হল। তারপর হাম্বিরের নামে চিঠি নিয়ে সেনাপতি বিদায় হলেন। তাঁর উপর হুকুম রইল— হাম্বিরের পরামর্শ মতো খুব সাবধানে কাজ করবে।

এদিকে উজলাগ্রামে শেয়ালরাজার মতো মুঞ্জ বাহাদুর রাজসিংহাসন আলো করে বিরাজ করছেন। ডাইনে বামে গম্ভীরমল আর চুয়োমল দুই নতুন মন্ত্রী কানে কলম গুঁজে বসে আছেন। আর রাজসভায় আছেন হাম্বির আর উজলাগ্রামের দু-এক পেট-মোটা জোতদার আর দু-চার কালো মুস্কো পাহাড়ী ভীল।

একজন গরিব প্রজা খাজনা দিতে পারেনি, রাজার লোক তাকে বেঁধে এনেছে। মুঞ্জরাজা হুকুম দিলেন, 'ওর মাথা কাটো।' অমনি হাম্বির কানে কানে বললেন, 'এরকম করলে প্রজালোকে খাপ্পা হবে। ওকে কিছু বকশিস দিতে হুকুম হোক।' অমনি দুই মোহর ইনাম হয়ে গেল, গরিব প্রজা দুই হাতে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। মনে-মনে বললে, 'রাজা তো হাম্বির, এটা তো ডাকাতের সর্দার, ওর কি দয়া-মায়া আছে?'

এমন সময়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে সেনাপতি এসে মুঞ্জ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা স্থির হল মহারানা কৈলোরের কেল্লা হাম্বিরকে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র পরিবার, নিয়ে কাশীবাস করুন, তাঁর খরচ-পত্র রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়া হোক, আর হাম্বির ভীল রাজার মন্ত্রী হয়ে রাজ্যশাসন করুন, সেজন্য তাঁকে সমস্ত খরচ-খরচা ও মাসিক ছ-হাজার তন্‌খা ও চিতোরের কেল্লা জায়গীর দেওয়াই স্থির।

গম্ভীরমল শর্ত আওড়ালেন, চুয়োমল একরারনামা লিখে হুজুরে পেশ করলেন, কিন্তু হুজুর তো পড়তে জানেন কত— কলম হাতে হাম্বিরের দিকে চাইলেন।

হাম্বির বললেন, ‘এ সব পাকা দলিলে কলমের সই দেওয়া ভালো নয়। আমি বলি মহারাজ এতে পাঞ্জা মোহর করে দিলেই ভালো হয়।

মুঞ্জবাহাদুর দুই হাতে কালি মেখে দলিলের দুই পিঠে হাতের ছাপ লাগালেন। সেনাপতি দলিল নিয়ে বিদায় হলেন। মুঞ্জবাহাদুর হাম্বিরের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, ‘এ তো বড়ো মজা। লড়াই নেই, হাঙ্গামা নেই, এক হাতের ছাপেই কাজ সাফ? দিল্লীর বাদশাকে এমনি একটা পাঞ্জা পাঠিয়ে চিতোরের কেল্লাটা দখল নিলে হয় না?’

হাম্বির বললেন, ‘আগে মেবার দখল করে নেওয়া যাক, তারপর দিল্লী পর্যন্ত ঠেলে যাওয়া যাবে। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদের হুকুম হোক। রানার সেনাপতি আমাদের জাঁক-জমকটা দেখে যাক।’

মুঞ্জ রাজা বললেন, ‘বন্ধু, তুমি যেমন বোঝো কম, কিন্তু দেখো, মাদলের বাজনা আর মহুয়ার কলসীটা ভুলো না। এ দুটো না থাকলে আমোদ হবে না।’

হাম্বির ভারে-ভারে মহুয়ার কলসী দলে-দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন। উজলাগ্রামে ভীল-রাজার রাজপ্রাসাদে আমাদের ফোয়ারা খুলে গেল। সেনাপতি এলেন, গম্ভীরমল এলেন, চুয়োমল এলেন, হাম্বির এলেন, গ্রামের প্রজালোক পাড়া-প্রতিবাসী যে যেখানে ছিল সকলে এল। আর সেই সঙ্গে এল শাদা কাপড়ে ভদ্রলোক সেজে একদল রাজপুত সৈন্য।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে, গ্রামবাসীরা যে-যার ঘরে ফিরেছে; ভীলের দল মহুয়ার কলসী খালি করে যেখানে-সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই সময় হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়ার পিঠে একটা রক্তমাখা চটের থলি চাপিয়ে উজলাগ্রাম থেকে

বিদায় হলেন। সেনাপতির উপর ভীল-রাজার রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম রইল।

হাম্বির যেমন সন্ধ্যাবেলায় বেতো ঘোড়ায় চড়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি সন্ধ্যাবেলা সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে কতদিন পরে রাজমুকুট সমেত মুঞ্জ ডাকাতের মুণ্ড নিয়ে ফিরে এলেন। কেল্লায় জয় জয়কার পড়ে গেল।

মহারানা সেই ভীলের কাঁচা রক্তে হাম্বিরের কপালে রাজটীকা লিখে দিয়ে বললেন, 'রাজপুতের নিয়ম সিংহাসনে বসবার আগে টীকাজের ব্রত সাঙ্গ করতে হয়। আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার এই ব্রত উদ্‌যাপন হল। আজ থেকে সিংহাসন তোমার, রাজমুকুট তোমার। কিন্তু মনে রেখো, মেবারের মুকুট উদ্ধার হল বটে, রাজ্য এখনো পাঠানের হস্তগত।' তারপর মহারানা সুজনসিংহকে ডেকে পাঁচ হাতিয়ার আর এক ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'তুমি মেবার ছেড়ে দক্ষিণ দেশে যাও। সেখানে তোমার ক্ষমতা থাকে তো নতুন রাজত্ব করো গিয়ে। মনে ভেবো না যে তোমাকে আমি স্নেহ করি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝছি, তোমার নির্বাসনে মেবারের মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে তোমার সন্তানেরা একদিন দক্ষিণ দেশে অখণ্ড রাজ্য বিস্তার করবে। যাও, মনে রেখো তুমি সূর্যবংশের সন্তান, তোমা হতে যেন সে বংশের কলঙ্ক না হয়। নিজের উপর নির্ভর করো, তবেই বড়ো হতে পারবে!'

হাম্বিরের রাজ্যলাভ

হাম্বির এখন শুধু হাম্বির নয়— ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা হাম্বির। নামটা শুনতে যতখানি, হাম্বিরের রাজত্ব কিন্তু ততখানি ছিল না। থাকবার মধ্যে কৈলোরের কেল্লা, আশে-পাশে খানকতক গ্রাম আর দুই হাজার মাত্র রাজপুত সেপাই! মেবারের মহারানা এখন ঠিক যেন একজন তালুকদার। এদিকে দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজীর হয়ে মালদেব তখন চিতোরে বসে সমস্ত মেবার শাসন করছিলেন। চিতোর থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে কৈলোরের কেল্লা। কোনো কোনো দিন আকাশ পরিষ্কার থাকলে কৈলোর থেকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা ঠিক যেন একখানি জাহাজের মতো আকাশ-সমুদ্রে ভেসে রয়েছে দেখা যেত।

হাম্বির লছমী মায়ের সঙ্গে কেল্লার ছাদে উঠে, লোক যেমন ঠাকুর দর্শন করে তেমনি— চিতোর দর্শন করতেন। সেই সময় সূর্যের আলোয় সকালবেলায় সোনার আকাশ-পটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল, দেবমন্দিরের সোনার চুড়ো নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত। হাম্বির বলতেন, ‘ওই দেখো মা, আমার জাহাজ দেখা দিয়েছে!’

রানীমা বলতেন, ‘জাহাজ তো তৈরি আছে। তুই যদি ঘুম দিতে থাকিস তবে জাহাজ বেদখল হয়।’

হাম্বির বলতেন, ‘এ জাহাজ মারে কার সাধ্য।’

হাম্বির যে ঘুম দিচ্ছিলেন না একথা লছমীরানী অতি অল্পদিনেই জানতে পারলেন। সেদিন দেওয়ালির পুজো। সন্ধ্যাবেলা হাম্বির এসে মাকে বললেন, ‘মা, দেওয়ালির আলো দেখবে তো ছাদে এসো।’

রানীমা হেসে বললেন, ‘আচ্ছা তুই এত বড়ো হলি তবু মায়ের সঙ্গে তামাশা করা রোগটা তোর এখনো গেল না? এই মাঠের মধ্যে দেওয়ালির আলো কোথায় পেলি? এ কি তোর চিতোর— যে ঘরে-ঘরে লোকে আলো দেবে?’

‘দেখবে এসো না মা’ বলে হাম্বির লছমীরানীকে নিয়ে কেল্লার ছাদে উঠলেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা— কিন্তু আকাশ ছেয়ে তারা ফুটে ছিল; যেন দেবতারা ফুল ছড়িয়ে গেছেন! রানীমা অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। হাম্বির হেসে বললেন, ‘মা, কী চমৎকার বাহার দেখেছ! কিন্তু এ দেওয়ালি তো দেবতাদের— তোমারও নয়, আমারও নয়। এখন একবার কৈলোরের দেওয়ালি— আমার দেওয়ালিরই আলোটা কেমন হয়েছে এদিকে দেখো দেখি।’

রানীমা চেয়ে-চেয়ে দেখলেন— কৈলোরের কেল্লার চারিদিকে পাহাড়ে-পাহাড়ে আলো জ্বলছে। গ্রামের পথে মাঠে-ঘাটে দিকে-দিকে লক্ষ-লক্ষ প্রদীপ, যেন তারার মালা, আরোর জাল। লছমীরানী অবাক হয়ে হাম্বিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন ‘এই জনমানবহীন কৈলোরে এত আলো, এত লোক কোথা থেকে এল?’

হাম্বির বললেন, ‘ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছ ওই আলো সব ভীলেরা জ্বালিয়েছে। আর যে গ্রামের দিকে দেখছ এসব গ্রামবাসীদের দেওয়া।’ রানীমা বললেন, ‘এত প্রদীপ, এত তেল, তুই এসব বুঝি চিতোর থেকে আমদানি করলি?’

হাম্বির বললেন, ‘শুধু চিতোর থেকে নয়, সমস্ত মেবার থেকে প্রদীপ আর তেল, প্রদীপ গড়বার কুমোর, তেল যোগাবার তেলিও আমদানি করেছি। ওই দেখো, কুমোর-পাড়ায় মশাল জ্বলছে; যাত্রা শুরু হল। ওই শোনো তামুলি-পাড়ায় ঢোল বাজছে; এখনি সঙ বার হবে। ওই যে মহাজন পট্টিতে নহবৎ বাজল, তোপখানায় বোমা ফাটল। দেখছ মা, হাম্বিরতালাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেয়েরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন।’

লছমীরানী বলে উঠলেন, ‘কী আশ্চর্য; এ যে নগর বসিয়ে ফেলেছিস দেখি! আমি বলি বুঝি তুই বসে-বসে কেবল ঘুম দিস। ভিতরে-ভিতরে তোর এত বুদ্ধি!’

হাম্বির বললেন, ‘তা যাই হোক মা, এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে। লক্ষ্মীপুর কেমন নাম?’

রানীমা বললেন, ‘আরে না না, ও যে বাঙালি রকম শোনাচ্ছে। আমি একটা ভালো নাম সন্ধান করছি। শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ। তুই আর দিন কতক সবুর কর।’

দুজনে যখন এই কথা হচ্ছে সেই সময় চিতোর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাম্বিরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি রুপোর পাতে মোড়া নারকেল এনে লছমীরানীর সম্মুখে ধরে দিলেন। রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে— ‘আমার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাকে আপনার চরণে দাসী করে আমার কুলকে পবিত্র করুন। আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু ধর্ম ছাড়িনি।’

রানী হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, ‘ দেখ দেখি, মালদেব চিতোর থেকে কেমন সুন্দর নারকেলটি পাঠিয়েছেন। এটা আজ দেওয়ালির পুজোর কাজে লাগবে।’

হাম্বির বললেন, ‘বেশ ফলটি, কিন্তু মা, এটার উপর প্রথম থেকেই আমার লোভ পড়েছে। এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই, এটা আমাকেই দাও।’

রানী হেসে বললেন, ‘তা বেশ তোমাকেই দেওয়া গেল— রাজাও একরকম দেবতা তো। কিন্তু শুধু ফল নিলে তো চলবে না, সঙ্গে-সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানি যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে হচ্ছে। যাও, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো করে জবাব লিখে নিয়ে এসো; আমি ততক্ষণ পুজো সেরে আসি।’ রানী পুজোয় গেলেন। হাম্বির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ব্যাপারখানা কী বলো দেখি?’ ব্রাহ্মণ বললেন, ‘মহারানা, সভায় চলুন, সমস্ত খুলে বলব।’

বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করে মালদেবের দূত চিতোরে ফিরে গেল।

এদিকে কৈলোরে বরযাত্রার উদ্‌যোগ চলতে লাগল। যত বুড়ো বুড়ো রাজপুত সর্দার লছমীরানীকে ধরে বসলেন— ‘মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে। মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনো মতেই উচিত নয়।’ রানীর হুকুমে পাঁচশো রাজপুত সেপাই বরযাত্রীর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হাম্বির মাকে প্রণাম করে বিদায় হলেন। লছমীরানী আশীর্বাদ করলেন, ‘বৎস, মালদেবের কন্যার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মীও তোমায় বরণ করুন।’ কৈলোর থেকে চিতোর অনেক দূর, কিন্তু হাম্বিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল!

বরযাত্রীরা যখন চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিমের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে। ঠিক যেন দেবদূতেরা মহারানার মাথায় ছাতা ধরেছেন।

কিন্তু মালদেব— যাঁর কন্যা আজ মেবারের অধীশ্বরী রাজরাজেশ্বরী হতে চলেছেন, তিনি কোথায়? কেল্লার দরজার একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়াল। মঙ্গল-শাঁখ নেই, কন্যাযাত্রীর আনন্দ নেই, যেন কোনো নির্জন পুরীতে হাম্বির প্রবেশ করলেন।

বুড়ো মন্ত্রী এসে হাম্বিরের কানের কাছে বললেন, 'মহারানা, যেন কেমন কেমন ঠেকছে! মালদেবের লক্ষণ ভালো নয়। আমার মতে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হয় না।'

হাম্বির বললেন, 'নিজের কেল্লায় নিজে প্রবেশ করব, তার আবার ভয়টা কী? চলে এসো— '

সেই সময় ফটকের এক কোণ থেকে মালদেব এসে বললেন, 'মহারানা, আমারও সেই আশা ছিল, আপনি নিজের ঘরে আসছেন তার জন্যে আবার অভ্যর্থনাই বা কী, বাজনা-বাদ্যিই বা কেন?

মন্ত্রী বললেন, 'মালদেব, তুমি কি জানো না রাজপুতদের নিয়ম আছে বিবাহের রাত্রে ফুলের কেল্লা দখল করে তবে কন্যা-কর্তার বাড়িতে বর প্রবেশ করেন? তোমার কন্যার সখীরা সে আয়োজন করেননি কেন?'

মালদেব বললেন, 'মন্ত্রী, আপনি কন্যার পিতা বটে, কিন্তু বাড়ি আমার কোথা? এটা যে মহারানার নিজেরই কেল্লা। নিজের ঘরে নিজে মহারানা এসে

প্রবেশ করছেন, সেখানে আমার কন্যার সখীরা এসে তাঁকে বাধা দিতে সাহস পাবে কেন?’

মন্ত্রী একটু হেসে বললেন, ‘দেখছি বাদশাহের মজলিসে আনাগোনা করে আপনার কুসংস্কার অনেকটা দূর হয়েছে। এখন চলুন, বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করুন! লছমীরানীর হুকুম, আজ রাত্রেই বরকন্যা নিয়ে আমরা কৈলোরে ফিরে যাব।’

হাম্বিরের পিতা পিতামহ যে রাজসভায় বসে রাজত্ব করতেন, সেই ঘরে হাম্বিরকে নিয়ে মালদেব যখন উপস্থিত হলেন, তখন হাম্বিরের বুকের ভিতরটা কেমন যে করে উঠল তা বলা যায় না। তাঁর মনে হল যেন সেই প্রকাণ্ড ঘরের একধারে চিতোরের শূন্য রাজসিংহাসন ঘিরে ছায়ার মতো সব বীরপুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে। তাঁদের গায়ে সোনার সাঁজোয়া, হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে কারু কথা নেই; হাম্বিরের সঙ্গে যত রাজপুত এসেছিল সবাইকার চোখ সেই সিংহাসনের দিকে। প্রকাণ্ড ঘরের আবছায়া অন্ধকারে চিতোরের শূন্য সিংহাসনের উপরে সোনার রাজচ্ছত্র আলো পেয়ে একবার ঝলমল করছে, আবার যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাম্বিরের সঙ্গে পাঁচশো রাজপুত সেই সিংহাসনকে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালেন, অমনি সেই অন্ধকার ঘর যেন আলো করে কমলকুমারী সখীদের সঙ্গে এসে হাম্বিরের গলায় পদ্মফুলের মালা দিলেন! চিতোরের রাজলক্ষ্মী এতদিন অনাথা বিধবার মতো শূন্য রাজপুরে যেন একা ছিলেন, আজ যেন কতদিন পরে চিতোরের রাজকুমারী এসে তাকে হাতে ধরে বরণ করে নিলেন।

কতদিন পরে চিতোরের কেল্লায় আর একবার মঙ্গলশাঁখ বেজে উঠল। চিতোরের গড় বড়ো-বড়ো তালা-বন্ধ ঘর নিয়ে এতদিন শূন্য পড়ে ছিল, আজ

সেই শাঁখের শব্দে পাঁচশো রাজপুতের তলোয়ারের ঝনঝনায় আর একবার যেন লোকে লোকারণ্য বোধ হতে লাগল, যেন তার আগেকার স্ত্রী আবার ফিরে এল।

সেইদিন থেকে দুই বৎসর না যেতে সত্যি-সত্যিই হাম্বির এসে চিতোরের কেল্লা দখল করে নিলেন। দিল্লীর নবাব মহম্মদ খিলজীর কাছে এ খবর পৌঁছতে গেল মালদেবের ছেলে বনবীর। তার আশা ছিল মালদেবের পরে সে-ই চিতোরে বসে রাজত্ব করবে। তাই সে মহম্মদ খিলজীর সঙ্গে পাঠান ফৌজ নিয়ে চিতোরের দিকে আসতে লাগল।

শিঙ্গোলীতে পাঠান বাদশা ফৌজ নিয়ে তাম্বু গেড়েছেন। লছমীরানীর সঙ্গে কমলকুমারী আর এক বছরের রাজকুমার ক্ষেতসিংহকে আর একবার কৈলোরের কেল্লায় পাঠিয়ে দিয়ে হাম্বির যুদ্ধে গেলেন।

বাঘ যেমন হরিণের পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি রাজপুত সৈন্য পাঠান ফৌজের উপর গিয়ে পড়ল। সেবারে মহম্মদ খিলজীকে আর দিল্লীর মুখে ফিরে যেতে হল না। হাম্বির তাঁর দুই পায়ে শিকল দিয়ে চিতোরের কেল্লায় এনে তাঁকে বন্ধ করলেন। বনবীরেরও সেই দশা। কমলকুমারীর ভাই বলে সে-যাত্রা হাম্বির তাঁকে প্রাণে না মেরে বন্দী করে কৈলোরে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

হাম্বির থাকেন কৈলোরে, আর চিতোরে কড়া পাহারার মধ্যে থাকেন দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজী। এক মাস, দু-মাস, তিনমাস যায়, হাম্বির আর চিতোরে যাবার নাম-গন্ধ করেন না। একদিন লছমীরানী তঁকে ডেকে বললেন, ‘তুই কি পাঠান বাদশাকে চিতোর ছেড়ে দিলি নাকি? সেখানে তোর রাজসিংহাসন, সেই চিতোর ছেড়ে কৈলোরে এসে বসে থাকা তো আর সাজে না। তোর রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসবার ইচ্ছে নেই কি?’

হাম্বির বললেন, 'মা চিতোরের সিংহাসনে বসতে হলে কী চাই তা জানো? শুধু মুঞ্জ ডাকাতের হাত থেকে চিতোরের রাজমুকুট কিংবা পাঠান ফৌজের কাছ থেকে চিতোর গড়টা কেড়ে নিলে বাপ্পারাওর সিংহাসনে বসা যায় না। ভবানী মায়ের হাতের খাঁড়াখানি যতদিন না সন্ধান করে পাওয়া যায় ততদিন তো রাজা হওয়া যাবে না। আগে সেই খাঁড়াখানির পুজো দিয়ে তবে রাজসিংহাসনে বসা চাই। সে খাঁড়া যে এখন কোথায়, তা কেউ জানে না। কেউ বলে পাঠানেরা লুটে নিয়ে গেছে, কেউ বলে রানী পদ্মিনীর সঙ্গে সে খাঁড়া চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে।

লছমীরানী বললেন, 'আমি এ দুটো কথার একটাও বিশ্বাস করিনে। লোকে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস ভবানীর খাঁড়া এখনো চিতোরেই আছে; কেবল চিতোরে এমন কেউ কাজের লোক নেই যে সেই খাঁড়াখানি যত্ন করে সন্ধান করে। লোকেরই বা দোষ দিই কেন? চিতোরের যে রাজা তাঁরই যখন কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না, তখন সামান্য লোকের এত কী গরজ যে খাঁড়াখানা সন্ধান করে তাদের রাজার হাতে তুলে দেয়!' সেই দিন হাম্বির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করলেন, 'ভবানীর খাঁড়া উদ্ধার করে তবে অন্য কাজ!'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আকাশে মেঘ করে একটু-একটু বৃষ্টি পড়ছে; হাম্বির ও কমলকুমারী দুজনে লুকিয়ে চিতোরের কেল্লায় এসেছেন। গ্রামবাসী চাষা-চাষীর সাজে কমলকুমারী পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আর হাম্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে মস্ত পাগড়িতে মুখের আধখানা ঢেকে গুটি-গুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেই দিকে। আকাশ দিয়ে কালো-কালো মেঘ হু-হু করে পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে। ঝড়ের তাড়ায় বড়ো-বড়ো গাছের ডালগুলো

মচমচ করে শব্দ করছে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, বাতাস এমন ঠাণ্ডা যে গায়ে লাগলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই অমাবস্যার রাত্রে ঝড়ে জলে ঘোর অন্ধকারে কমলকুমারী হাম্বিরকে নিয়ে মহাশ্মশানের ভিতর এসে উপস্থিত হলেন। চোখে কিছু দেখা যায় না, কেবল একদিক থেকে ঝরঝর করে একটা শব্দ আসছে— যেন অন্ধকারের ভিতরে একটা ঝরনা পড়ছে।

যেদিক থেকে জলের শব্দ আসছিল, সেইদিক দেখিয়ে কমলারানী হাম্বিরকে বললেন, 'ও ঝরনার ধারে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, তারই পাশ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পাতালের দিকে নেমে গেছে; সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে পদ্মিনীরানী চিতার আগুনে পুড়ে মরেছিলেন। ওই সুড়ঙ্গের শেষে একটা গুহায় কারুণী দেবীর মন্দির! শুনেছি সেইখানে একটা অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে, আর ঠিক তার মাথার উপরে ভবানীর খাঁড়া ঝুলছে। আমি অনেকবার সেই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত গেছি কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয়নি!'

হাম্বির বললেন, 'তুমি সুড়ঙ্গ পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলো; সেই বটগাছের তলায় তোমাকে রেখে আমি ভেতরে যাব।'

শ্মশানের একধার দিয়ে একটা আঁকা-বাঁকা সুঁড়ি-পথ অন্ধকারের দিকে নেমে গেছে! দুজনে সেই পথে পায়ে-পায়ে চললেন; কতদূর চলে সামনে একটা জলের নালা— আর রাস্তা নেই! পাথর কেটে ঝরনার জল কুলকুল করে ছুটে চলেছে। নালার জল এক হাঁটু, কিন্তু বরফের মতো ঠাণ্ডা— পা রাখা যায় না।

হাম্বির কমলারানীকে দুই হাতে তুলে ধরে সেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে সেই বটগাছের দিকে চলেছেন। শুনতে পাচ্ছেন, দূরে যেন পাহাড়ের ভিতর থেকে ঝনঝন করে একটা শব্দ আসছে! কারা যেন লোহার কপাট ধরে নাড়া দিচ্ছে।

বটগাছের একটা শিকড় ধরে হাম্বির ডাঙায় উঠলেন। সেখানটা এমন নিস্তব্ধ, এমন অন্ধকার যে মনে হয়, পৃথিবী ছেড়ে কোথাও এসেছি!

সেই বটতলায় কমলারানীকে বসিয়ে রেখে হাম্বির অন্ধকারে দুহাত বাড়িয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে চললেন। দুদিকে পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে জল পড়ছে! একটু আলো নেই, একটু শব্দ নেই, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না! নীল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাম্বির একা চলেছেন। একবার তাঁর পায়ে ঠেকে কী একটা গড়গড় করে, গড়িয়ে গেল। হাম্বির সেটা হাতে তুলে দেখলেন একটা মড়ার মাথা! কখনো তাঁর পায়ের চাপনে একখানা শুকনো মড়ার হাড় মড়মড় করে গুঁড়িয়ে গেল। কখনো পাহাড়ের ফাটল বেয়ে একটা গাছের শিকড় নেমেছে, সেটা তাঁর হাতে ঠেকছে মনে হল যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে; কখনো তিনি দূরে থেকে যেন ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন; কখনো মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে; এক-এক জায়গায় আলেয়া একবার দপ করে জ্বলেই নিবে যাচ্ছে; কোথাও মনে হচ্ছে পাথরের দেয়াল কত দূরে যেন সরে গেছে; আবার এক-এক জায়গায় দেয়াল যেন চেপে পড়তে চাচ্ছে। এক জায়গায় শুনলেন মাথার উপর থেকে কাদের যেন কান্নার শব্দ আসছে; পা যেন তাঁর ছাইগাদায় বসে যেতে লাগল; মাথার উপর হাম্বির চেয়ে দেখলেন অনেক দূরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে— চারিদিকে তার গোল পাথরের দেয়াল, কোনো দিকে আর যাবার পথ নেই! সেই অন্ধকূপের ভিতর হাম্বির চারিদিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। নিচে পথ নেই, উপরে পথ নেই, আশেপাশে পাথরের দেওয়াল, তারি মাঝে স্তূপাকার ছাই, চলতে গেলে পা বসে যায়।

কতক্ষণ হাম্বির সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এমন সময় পাথরের দেয়ালের উপর থেকে শুনলেন শাঁখ ঘণ্টার শব্দ আসছে! দেখতে-দেখতে হাম্বিরের চোখের সামনে খানিকটা পাথরের দেয়াল দুফাঁক হয়ে সরে গেল; সেই ফাঁক দিয়ে হাম্বির দেখলেন, গেরুয়া কাপড় রুদ্রাক্ষের মালা পরা পাঁচজন ভৈরবী আগুনের উপরে একখানা প্রকাণ্ড লোহার কড়া ঘিরে বসে রয়েছেন। অনেকদূরে কারুণী দেবীর সোনার মূর্তি আগুনের আলোয় ঝকঝক করছে। হাম্বির নির্ভয়ে কারুণীর মন্দিরে যেখানে ভৈরবীরা বসে রয়েছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। হাম্বিরকে দেখে ভৈরবীরা বিকট চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘কেরে তুই! কী চাস?’

হাম্বির নির্ভয়ে বললেন, ‘আমি এসেছি যা আমার তাই চাইতে। মা ভবানী বাপ্পাকে যে খাঁড়া দিয়েছিলেন, সে খাঁড়া এইখানে আছে, আমি তাই চাই! তারই জন্যে আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন— আমি চিতোরের রানা হাম্বির!’

ভৈরবীরা হাম্বিরের কথার উত্তর না দিয়ে আগুনের উপর সেই লোহার কড়াখানার দিকে দেখিয়ে দিলেন। হাম্বির ছুটে গিয়ে যেমন সেই কড়াখানার ভিতর হাত দিয়েছেন অমনি কোথায় সে আগুন, কোথায় সে কড়া, কোথায় বা সে ভৈরবীর দল! হাম্বির দেখলেন ভবানীর খাঁড়া হাতে তিনি কমলারানীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন; আর অজগর সাপের মতো খানিকটা ধোঁয়া সেই সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে চলেছে আস্তে-আস্তে। হাম্বির ভবানীর খাঁড়া হাতে যেদিন চিতোরের রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন, যেদিন সমস্ত রাজস্থানে জয়-জয়কার পড়ল। দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজী সেদিন পঞ্চাশ লাখ মোহর হাম্বিরকে নজর দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন এ জীবনে আর চিতোরমুখো হবেন না; তবে তিনি ছাড়া পেলেন।

কমলকুমারী হাম্বিরকে ভবানীর খাঁড়াখানির সন্ধান দিয়েছিলেন বলে হাম্বির তাঁর কথায় বনবীরকে ছেড়ে দিলেন আর কৈলোরের কেল্লার নাম রাখলেন— কমলমীর।

লছমীরানী হাম্বিরকে সিংহাসনে বসিয়ে উজলাগ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন তাঁর সেই ছেলেবেলার ঘরে নদীর পারে খেতের ধারে।

চণ্ড

হাম্বিরের নাতি লখারানা— লড়াই করতে-করতে তিনি এখন বুড়ো হয়েছেন। আর তাঁর তলোয়ার, সে শত্রুর মাথা কাটতে-কাটতে এমন ভোঁতা হয়ে গেছে যে কেবল মুঠসার একগাছা আখ কাটবারও ধার তাতে নেই। তলোয়ারের ধার না থাকুক লখারানার কিন্তু কথার ধার খুবই ছিল; ঠাট্টায় তামাশায় তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য। বয়সের সঙ্গে রানার মসকরা করবার বাতিক ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

সে একদিনের কথা— শাদা জামাজোড়া, শাদা দোপাট্টা, পাকা চুলের উপরে ধবধবে পাগড়ি পরে লখারানা লক্‌কা পায়রাটি সেজে বসে আছেন। পাহাড়ের উপর শ্বেত পাথরের খোলা ছাদ— আধখানায় চাঁদের আলো পড়েছে, আর আধখানায় কেল্লার উঁচু পাঁচিলের কালো ছায়া বিছিয়ে গিয়েছে; রানার চারিদিকে সভাসদ পারিষদ, সকলের হাতে এক-এক খোরা সিদ্ধি। এখনি জলসা শুরু হবে— চাকরেরা বড়ো-বড়ো থালায় ফুলের মালা, পানের দোনা এনে রেখেছে, গোলাপ আর আতরের গন্ধ, ছাদের এক কোণে একদল নাচনী সোনার ঘুঙুর এ-ওর পায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় রাজকুমার চণ্ডের সঙ্গে মাড়োয়ারের রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে রণমল্লের দূত এসে উপস্থিত— রুপোর পাতে মোড়া একটি নারকেল হাতে। মাড়োয়ারের দূত বেশ একটু মোটা; তার উপর এগারোগজি থানের প্রকাণ্ড এক পাগড়ি বেঁধেছেন আর তাঁর আগে-আগে পেটটি এগিয়ে চলেছে। দূতকে দেখে লখারানা অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন

কিন্তু এই মানুষ-লাটিমকে নিয়ে একটু মসকরা করবার লোভ তিনি আর কিছুতেই সামলাতে পারলেন না।

রানা দূতের হাত থেকে রুপোয় মোড়া নারকেলটি নিজেই নিয়ে বলছেন, ‘বা, বেশ তো, এটা বুঝি তোমার রাজা এই বুড়ো বয়সে আমার খেলার জন্যে পাঠিয়েছেন?’

দূতের বলা উচিত ছিল— আজ্ঞে না, এটি রাজকুমার চণ্ডের জন্যে কেননা তাঁরই সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর বিয়ের কথা নিয়ে এসেছি, আপনার মতো পাকা দাড়ির খেলার জিনিস এটি নয়— কিন্তু রানার ভাবগতিক দেখে দূতের মুখে আর কথা সরছে না। এদিকে সভাসুদ্ধ লোক মুখ টিপে হাসছে, ওদিকে লজ্জায় রাজকুমার চণ্ডের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। দূত তখন বিষম সমস্যায় পড়ে বলছেন, ‘মহারানা, বড়ো সুখের কথা যে আপনি নিজেই আমাদের রাজকুমারীকে চাইলেন, আমাদের দেশের রাজা গরীব, তাঁর এতদূর সাহস কেমন করে হবে যে বিয়ের সম্বন্ধ করে মহারানাকে নারকেল পাঠাবেন? তিনি চেয়েছিলেন রাজকুমারকে জামাই করতে, কিন্তু কি আশ্চর্য, তিনি স্বপ্নেও যা আশা করেননি তাই ঘটল! মহারানার যদি হুকুম হয় তবে আমি আমার রাজাকে গিয়ে এই সুখের খবর এখন পাঠিয়ে দিই’— বলেই দূত উঠতে যান— রানা তখন কী জবাব দেন, তাড়াতাড়ি দূতের হাত ধরে বললেন, ‘রোসো, আমি তামাশা করছিলাম, ডাক কুমার বাহাদুরকে’— কুমার তখন সভা ছেড়ে উঠে গেছেন। রানার দূত চণ্ডের কাছে ছুটল কিন্তু চণ্ড বলে পাঠালেন— মহারানা তামাশা করেও যে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন তিনি আজ থেকে আমার মায়ের তুল্য, আমি কিছুতেই তাঁকে বিয়ে করব না।

বুড়ো রানা বড়ো বিপদেই পড়লেন। কী আশ্চর্য, ছেলেটা তামাশা বোঝে না। লোকের পর লোক রাজকুমারকে বোঝাতে ছুটল কিন্তু চণ্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। রানা নিজের কথার ফাঁদে নিজেই বাঁধা পড়লেন। এবারের তামাশা যে জাদুকরের আমগাছের মতো দেখতে-দেখতে এমন সত্যি হয়ে উঠবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি; বিয়ে করতে দুঃখ নেই কিন্তু তামাশাটা যে দূতকে ছেড়ে উল্‌টে তাঁকে নিয়েই শুরু হল এইটেতেই তাঁর আপত্তি।

অনেক বোঝানোর পরেও যখন চণ্ড বিয়ে করতে রাজি হলেন না, তখন রাগে বুড়ো রানা পাকা দাড়িতে মোচড় দিয়ে বললেন, ‘দেখো চণ্ড, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখো; কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করলেম, এবার আমার যে ছেলে হবে তাকেই আমি সিংহাসন দেব, সে-ই হবে রানা আর তোমাকে তার একজন সামন্ত হয়ে থাকতে হবে।’ চণ্ড একলিঙ্গ মহাদেবের নামে শপথ করে বললেন, ‘তাই হবে!’ সভাসুদ্ধ লোক চুপ হয়ে রইল। মাড়োয়ারের দূত রানার বিয়ের হুকুম নিয়ে বিদায় হল।

বুড়ো বয়সে বর সেজে যে তামাশা দেখাতে হল সেটা লখারানার বড়োই বাজল; তিনি চণ্ডকে কিছুতে ক্ষমা করতে পারলেন না। বিয়ের দুবছর পরে দুমাসের ছেলে মকুলকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি এক কম্বল এক লোটা নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন— কবে কোনখানে জীবনের বিষম তামাশার থেকে তাঁর যে নিষ্কৃত হল তা জানা গেল না।

মকুল তখন ভারি ছোটো, নেহাত কচি— কাজেই রাজার যা কিছু কাজ সবই চণ্ডকে করতে হয়, রাজা না হয়েও তিনি রাজা। দেশের লোকের মুখে চণ্ডের সুখ্যাতি আর ধরে না। চণ্ডকে তারা যেমন ভয় করে তেমনি ভক্তিও করে,

ভালোওবাসে; এটা কিন্তু মকুলের মায়ের আর যত মাড়োয়ারী মামার দলের প্রাণে সয় না। চণ্ড কাউকে কিছু বলেন না— কিন্তু বোঝেন তাঁর আর বেশী দিন এ রাজ্যে থাকা চলবে না। এই রাজবাড়ি যেখানে চণ্ড মায়ের কোলে মানুষ হয়েছেন, বাপের আদরে বেড়ে উঠেছেন, এখানে তাঁর আপনার বলতে আজ কে আছে? পুরোনো চাকর যারা ছিল মহারানী তাদের তাড়িয়ে নিজের দেশ থেকে যত মাড়োয়ারী এনে কাজে রেখেছেন। তাঁর নিজের যে মহল সেখানে রানীর ভাইরা এসে ঢুকেছেন, তাঁর যে সোনা-রুপোর খাট-বিছানা আসবাবপত্র সবই এখন মকুলের, রাজবাড়িতে নিজের বলতে রয়েছে একমাত্র তাঁর তলোয়ার! কিন্তু মকুল— সেই অফুরন্ত ফুলের মতো কচি মকুল, তাঁর চেয়ে পঁচিশ বছরের ছোটো মকুল, সেই হাসি মুখে ছোটো ভাই মকুল— যে এখনো চলতে শেখেনি, সে কি তাঁর আপনার নয়? সকালে সন্ধ্যায় রাজসভাতে নিয়ে যাবার সময় সে যখন তার ছোটো দুটি হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, তখন কি আর চণ্ডের কোনো দুঃখ মনে থাকে? চণ্ড কতবার মনে করেছেন চলে যাই, কিন্তু এই ছোটো ভায়ের ছোটো হাতের বাঁধন— তাঁর সব দুঃখের উপরে কচি দুখানি হাতের পরশ— একে ছেড়ে যাওয়া, একে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া চণ্ডের আর হয়ে ওঠে না! তিনি বছরের পর বছর সব দুঃখ সয়ে এই ছোটো মকুলকে একদিন মেবারের রাজসিংহাসনে বসবার মতো উপযুক্ত করে, মানুষ করে তুলতে লাগলেন। দারুণ গরমের দিনে সকাল-সকাল সভা ভঙ্গ করে মকুলকে নিয়ে চণ্ড খোলা ময়দানে গোলা-খেলা করতে যান, চণ্ড চড়েন এক ঘোড়ায় আর এক টাট্টুতে মকুল— মাথার উপরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে, কোথাও একটু ছায়া নেই এরি মাঝে দুই ভায়ের ঘোড়া বিদ্যুতের মতো গোলার পিছনে পিছনে ছুটে-ছুটে চলেছে— মুখে চোখে আগুনের

মতো বাতাস লাগছে, দুই ভায়ের মুখ রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে সূর্যের তাপে। আবার হয়তো কোনো দিন ঘোরতর মেঘ করে ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি নেমেছে— চণ্ড চলেছেন মকুলকে নিয়ে শিকারে— কাদা ভাঙতে-ভাঙতে, জলে ভিজতে-ভিজতে, থৈ-থৈ করছে নদীর জল, সাঁতার দিয়ে তা পেরিয়ে, বাড়ি থেকে অনেক দূরে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকখানি জঙ্গল আর জলার মাঝে। শীতের দিনে তাদের খেলা পাহাড়ে-পাহাড়ে। সেখানে বরফের মতো বাতাস ধারালো ছুরির মতো বুকে এসে লাগে। এমনি করে মকুল মানুষ হচ্ছেন, দিন-দিন শক্ত হচ্ছেন, তাঁর খাওয়া-পরা খেলাধূলা রাজার ছেলে বলে কিছু যে আরামের ছিল তা নয়— চণ্ড মেবারের একজন সামান্য রাজপুতের ছেলের সঙ্গে যে একদিন মেবারের সর্বময় কর্তা হবে তার কোনো বিষয়ে কিছু তফাত রাখলেন না; এমনি করে লখারানা চণ্ডকে মানুষ করেছিলেন, আর ঠিক তেমনি করে চণ্ড তাঁর ছোটো ভাইকে সিংহাসনের উপযুক্ত হবার, আপদে-বিপদে দুঃখে-কষ্টে বীরের মতো নির্ভয়ে থাকবার জন্যে ছোটোবেলা থেকেই তৈরি করছেন। এটা কিন্তু মকুলের মায়ের ভালো লাগে না। তিনি চান গরমে মকুল পাকার বাতাসে, বাদলে ছাতার তলায়, শীতে লেপ-তোশকের মধ্যে থেকে মোমের পুতুলটির মতো গোলগাল মোটাসোটা হয়ে উঠুক! এর জন্যে মকুলকে আর কখনো কখনো চণ্ডকেও মহারানীর কাছে গঞ্জনা সইতে হয়। মকুল সে ছেলেমানুষ মায়ের ধমকে কখনো রাগ করে, কখনো খানিক কাঁদে আবার একটু পরেই সব ভুলে যায়— চণ্ডের প্রাণে কিন্তু রানীর বাক্যবাণ তীরের মতো গিয়ে বাজে।

এক-একদিন তিনি আপনার খুব প্রাণের যাঁরা বন্ধু বুড়ো-বুড়ো সর্দার তাঁদের কাছে বলেন— 'আর না, এখানে আর থাকা চলে না। সবাই বলে আমি

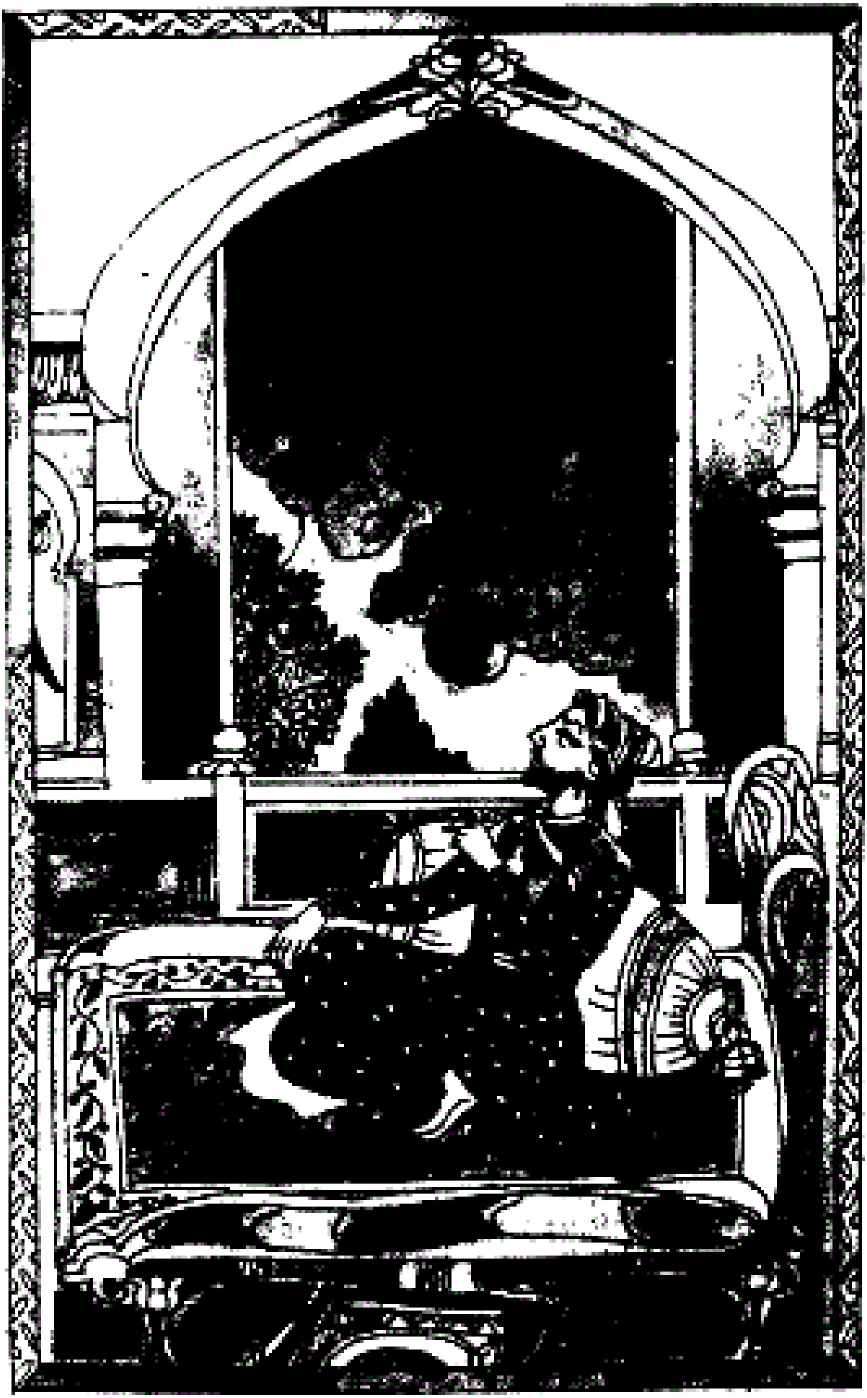

আমার ভাইকে বশ করে নিয়ে নিজে রাজাগিরি করছি; সে যখন আমার হুকুমে ওঠে-বসে, তখন আমিই হলেম সত্যি রাজা আর সে একটা সাক্ষিগোপাল— নামমাত্র মেবারের রাজা। আপনারা আমায় ছুটি দিন, আমি অন্য রাজ্যে গিয়ে থাকি!' বুড়ো সর্দারেরা বলেন, 'এখনো সময় হয়নি, যুবরাজ, আরো কিছুদিন থাক, মকুল আর একটু উপযুক্ত হয়ে উঠুক।'

চণ্ড চান কোনো সর্দারের হাতে মকুলকে মানুষ করবার ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু কোনো সর্দার সে ভার নিতে চাইলে তবে তো! তাঁরা কেবলই বলেন— আমরা মকুলের জন্য সব করতে প্রস্তুত, কিন্তু যুবরাজ তবু আমরা পর মাত্র আর আপনি তার ভাই। চণ্ড আর কোনো জবাব দিতে পারেন না। বাপ থাকলে কেউ তো চণ্ডকে মকুলের জন্য কষ্ট নিতে বলত না; কিন্তু এখন ভাই যদি তাকে না দেখে তবে মকুলকে রাজা হবার মতো শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলে কে?

এমনি করে দিন কাটছে, ইতিমধ্যে একদিন— কাল বৈশাখের রাতদুপুরে অন্ধকার দিয়ে বড়ো-বড়ো শাদা মেঘ একখানার পর একখানা আস্তে আস্তে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে, মনে হচ্ছে যেন বড়ো-বড়ো পাল তুলে আকাশের এপার থেকে ওপারে, অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছে একটির পর একটি নৌকা! একটি তারা নেই, একটু শব্দ নেই। চণ্ড সারাদিনের কাজ সেরে সেই দিকে চেয়ে আছেন ঘরের আলো নিবিয়ে একলাটি, রাজবাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, কেবল চণ্ড জেগে একা। আজ চণ্ডের বুকের ভিতরে একটা বেদনা থেকে-থেকে দুই পাঁজরের হাড়গুলো মোচড় দিয়ে-দিয়ে যেন ভাঙতে চেষ্টা করছে। ব্যথা যে কিসের, বেদনা যে কতটা, চণ্ড তা বুঝতে পারছেন না; তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে মকুলকে একবার কাছে

ডাকি কিন্তু উঠতেও পারছেন না, ডাকতেও পারছেন না। অন্ধকারের মধ্যে একলাটি চুপ করে পড়ে রয়েছেন। চণ্ডের দেহ-মন সমস্ত অসাড় হয়ে মরে গেছে কেবল তাঁর চোখ যেন জীবনের সব আলোটুকু টেনে নিয়ে প্রহরের পর প্রহর বর্ষা রাতের অন্ধকারে কী যেন সন্ধান করে ফিরছে! একটা ঝড় অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় গাছপালা ঘরবাড়ি জলস্থল আকাশ দুলিয়ে চলে গেল, অনেকখানি বৃষ্টির জল ঝরঝর করে চারিদিকে ঝরে পড়ল, বিদ্যুৎ বাজ খানিক চমক দিয়ে ধমক দিয়ে চলে গেল; তারপরে মেঘ আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রি শেষের সঙ্গে রুপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে করে ভোরের একটি ছোটো পাখির গানের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলায় ফুটন্ত কচি আলোর মাঝখানে একখানি জলেভরা মেঘ! চণ্ড দেখছেন, সে চোখ জুড়ানো শান্ত রূপ— যেন তাঁর মা। চণ্ড সেই মেঘের দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছেন না, সারারাত্রি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দুই চোখ যে এরই সন্ধানে, তাঁর মরা মায়ের সন্ধানে ফিরছিল, এতক্ষণে দেখা পেলেন; তাঁর বুকের বেদনা, টানা-তার ছেড়ে দিলে যেমন, তেমনি কাঁপতে-কাঁপতে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। সেই সারারাতে বাদল দিয়ে ধোয়া মেঘ, সেই মায়ের চোখের জলে জলভরা সেই সকালের মেঘ, তারই দিকে চেয়ে চণ্ড ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে বেলা হয়েছে। রাজসভায় যাবার ঘণ্টা পড়েছে— মহারানী মকুলকে সাজগোজ করিয়ে বসে রয়েছেন এমন সময় মকুলের দাই এসে বললে, ‘রানীমা, আজ আর সভা বসবে না; বড়োকুমার চণ্ডের শরীর খারাপ হয়েছে।’ সেখানে মহারানীর বাপ রণমল্ল বসেছিলেন; তিনি বলে উঠলেন, ‘কেন,

বড়োকুমার নইলে রাজসভা বন্ধ থাকবে, রানা মকুল কি কেউ নয়?' দাই সে অনেক দিনের, চণ্ডকেও সে মানুষ করেছে— রণমল্লের কথায় কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, রানী তাকে ধমকে বললেন, 'যা, তোর আর তকরার করতে হবে না; বাবা এখুনি মকুলকে নিয়ে সভায় যাচ্ছেন; তুই সর্দারদের বসতে বলগে যা!'

মেবারের সিংহাসনে সেই দিন, সূর্যবংশের কেউ না বসে, বসল কিনা পেটমোটা মাড়োয়ারী রণমল্ল নীতি মকুলকে কোলে নিয়ে! লজ্জায় সর্দারদের মুখ লাল হয়ে উঠল! সেই সময় চণ্ড হঠাৎ ঘুমের থেকে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন আকাশে গ্রহণ লেগেছে, সূর্য একখানা কলঙ্ক-ধরা তামার থালার মতো দেখা যাচ্ছে, আর সেই বুড়ি দাই তাঁর পায়ের তলায় বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

সেদিন সভাভঙ্গের পর বর্ষাকালের আকাশের মতো মুখ আঁধার করে রাজপুত সর্দারেরা যখন চণ্ডের কাছে এসে উপস্থিত, তখন চণ্ড তাঁদের হাত ধরে অনুরোধ করে বললেন, 'দেখুন, মহারানীমা'র ইচ্ছা নয় যে, আমি আর মেবারের কোনো রাজকার্য চালাই; কাল রাত্রে একথা মহারানীমা নিজের মুখে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আজ সকালে তাঁরই হুকুমে মাড়োয়ারের রাজা রণমল্ল মকুলের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন, এখন থেকে রাজ্যের কাজ তিনিই চালাবেন, আমার এখন ছুটি; মায়ের আদেশ আজ সকালে আমার কাছে পৌঁচেছে, মকুলকে আর এই বাপ্পার সিংহাসন আপনাদের জিম্মায় রেখে আমি এখনি বিদায় হব, আমার ঘোড়া প্রস্তুত।'

বুকের ভিতর কী বেদনা নিয়ে চণ্ড যে সারারাত কাটিয়েছেন তা আর কারো বুঝতে বাকি রইল না, তাঁরা কোনো কথা না কয়ে চণ্ডকে প্রণাম করে বিদায় হলেন।

চণ্ড তখন তাঁর দাই-মাকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন, 'মকুলের যাতে ভালো হয়, তার কোনো বিপদ না ঘটে দেখবে; আমার ছোটো ভাই রঘুদেও কৈলোরে আছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে মাণ্ডুর রাজার কাছে চললেম। মহারানীকে বলবে যদি কোনোদিন কোনো বিপদ আসে, রাজ্যে যদি কোনো গোলমাল হয় তবে আমি কাছেই রইলেম, আমাকে ডেকে পাঠালেই আবার আসব; আমার তলোয়ার মকুলের শত্রুর জন্যে আর মেবারের জন্যে আমার প্রাণ। দাই-মা, এরা কি যাবার আগে মকুলকে একবার দেখতে দেবে না?'

দাই ঘাড় নেড়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল; চণ্ড বুঝলেন ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই; তিনি একটি কথা না কয়ে যেমন সাজে ছিলেন তেমনি, কেবল তলোয়ারখানা কোমরে বেঁধে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন— তখন মাথার উপরে দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মকুল যখন শিকার খেলতে যাবার সময় তার দাদাকে খুঁজতে লাগল, তখন রানী বললেন, 'তোর দাদাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, সে আর আসবে না।'

সারাদিন মকুলের চোখ ছল-ছল করতে লাগল, সে শূন্য রাজপুরীতে কোথাও তার দাদাকে খুঁজে পেলে না। রাত্রে যখন সবাই শুয়েছে তখন মকুল তার দাই-মার গলা জড়িয়ে বললে, 'যে বাঘ দাদাকে মেরেছে তাকে আমি বড়ো হয়ে নিশ্চয়ই মারব; তলোয়ারের এক চোটে তার মাথাটা কেটে এনে তোমায় দেব কেমন?'

দাই বললে, 'রানাসাহেব, আমি সেই বাঘটা ধরবার একটা দড়ির শক্ত ফাঁদ কালই বানিয়ে রাখছি— বাঘটাকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া হবে না!'

মকুল খানিক চুপ করে বললে, 'দাই-মা বাঘটা দেখতে কেমন? আমি তো বাঘ দেখিনি, তাকে চিনতে পারব তো?'

'ঠিক চিনতে পারবে, নয়তো আমি চিনিয়ে দেব। তোমার ওই মাড়োয়ারী দাদামশায়ের মতো তার পেটটা মোটা আর ঠিক এমনি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফও আছে।'

তার পরদিন সকালে যখন দাই মকুলকে সাজ পরিয়ে রাজসভায় তার বুড়ো দাদার কাছে দিতে গেল তখন রণমল্ল পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে চোখ পাকিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'দাই, বাঘ ধরবার ফাঁদ তৈরি করতে সময় লাগবে, সেজন্যে আজ থেকে তোমায় ছুটি দিলেম। আমার দেশের এক ভালো দাই সে-ই রানীর কাজ করবে, তুমি বসে-বসে ফাঁদ বাঁধো গিয়ে জঙ্গলে' দাই 'যো হুকুম' বলে খুব একটা বড়ো সেলাম রণমল্লকে দিয়ে মকুলকে বললে, 'রানাসাহেব, বাঘটাকে চিনে রেখ— ঠিক তোমার বুড়ো দাদার মতো গোঁফ দাড়ি ওমনি মোটা পেট আর বড়ো বড়ো দাঁত।' সভাসুদ্ধ লোক মুখ টিপে হাসতে লাগল। মকুল দুই চোখে একটা ভয় নিয়ে রণমল্লের দিকে চেয়ে এক দৌড়ে দাইয়ের কোলে গিয়ে উঠল।

দাই তার মুখে চুমু খেয়ে বললে, 'বেটা ডরো মাৎ, সেরকো দেখ ভাগনা কভি নেহি, মার তলোয়ার কী চোট, কাট্ লে শির্।' সভাসুদ্ধ লোকের মুখে হাসি চাপা থাকে না দেখে রণমল্ল কথাটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে দাইয়ের পিঠ চাপড়ে তার হাতে একজোড়া সোনার বালা দিয়ে

বললেন, ‘ভালো-ভালো, আমি খুব খুশি হলেম, এমনি করে মকুলকে সাহস দিয়ে এখন থেকে বাঘ শিকারে মজবুৎ করে তোল; আজ থেকে তোমার তলব আরো দশ-তন্‌খা বাড়িয়ে দেওয়া গেল, মকুলজী বড়ো হওয়া পর্যন্ত তুমিই তার তদারক করবে।’

সভাসুদ্ধ লোক বুঝলে রণমল্লকে যদি কেউ জব্দ করতে পারে তবে সে দাই, আর রাজবাড়িতে তার মতো মকুলের বন্ধুও আর কেউ নেই। মেবারের সমস্ত রাজপুত সর্দার, যাঁরা রানীর খাতিরে রণমল্লকে ভয় করে একটি কথা কইতেন না, তাঁরা আজ এই দাইকে মনে-মনে তার সাহসের জন্যে তারিফ না করে থাকতে পারলেন না। রণমল্ল সেদিন মাথা হেঁট করে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

চণ্ডের ছোটো ভাই রঘুবীর, কিন্তু মেবারের সবাই তাঁকে নাম দিয়েছিল রঘুদেব— রূপে গুণে তিনি ছিলেন বাস্তবিকই দেবতার মতো। নগরের বাইরে রাজ্যের গোলমাল থেকে অনেক দূরে একখানি সুন্দর বাগানঘেরা ছোটোখাটো পাথরের বাড়ি, তারই মধ্যে রঘুদেব একলা রাজার ছেলে হয়ে তপস্বীর মতো দীন দুঃখী কাঙাল নিয়ে থাকতেন। তাঁর মুখের কথা— সে যেন ছোটো-বড়ো সবার মন গলিয়ে গানের মতো গিয়ে প্রাণে বাজত। রাজ্যে তাঁর শত্রু ছিল না— এমন-কী যে, মহারানী চণ্ডকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখতেন তিনিও রঘুদেবকে গুরুর মতো ভক্তি, ভায়ের মতো ভালোবাসা দিয়েছিলেন।

আর মকুল— সে ছোড়দাদার মুখের গল্প, তাঁর সেই বাগানে ফল পেড়ে বনভোজন, গাছের পাখিদের বাসার খুব কাছে গিয়ে তাদের ছোটো ছোটো

ছানাগুলিকে খাইয়ে আসা, গাছের ছায়ায় বসে বাঁশের বাঁশিতে রাখাল ছেলেদের কাছ থেকে গান শেখা, এই সব আনন্দের কথা কখনো ভুলবে না।

চণ্ড গিয়ে অবধি সে তার ছোড়দার কাছে যাবার জন্যে রোজ কাঁদছে, রানীর ইচ্ছে তাকে কিছুদিনের জন্যে সেখানে পাঠিয়ে দেন কিন্তু রণমল্ল কেবলি বাধা দিচ্ছেন। রানী একবার রঘুদেবকে রাজবাড়িতেই না হয় আনবার কথা বললেন কিন্তু তাতেও আপত্তি! শেষে একদিন রণমল্ল স্পষ্টই বলে দিলেন যে, তাঁর হুকুম ছাড়া রঘুদেবের সঙ্গে দেখা কিংবা তাঁকে এখানে আনানো হতে পারবে না— রানীর সেইদিন চোখ ফুটল; তিনি বুঝলেন, রাজ্যের কাজে তাঁর আর কোনো হাত নেই, এই পাথরের রাজবাড়ি চারখানা দেওয়ালের মধ্যে তিনি আর মকুল দুজনকে বন্দীর মতো থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল রঘুদেব মকুলকে দেখতে নগরে আসছিলেন, হঠাৎ মারা পড়েছেন; দেশের লোক হাহাকার করে বলছে রণমল্ল তাঁকে বিষ দিয়ে খুন করেছে, সমস্ত মেবার তাঁর মূর্তি ঘরে-ঘরে রেখে পুজো করছে আর মাড়োয়ারী শেয়ালরাজা আর তার দলবলকে খুনে, বদমাস, চোর বলে অভিসম্পাত দিচ্ছে। বুড়ি দাই রানীকে এসে বললে, 'এখনও যদি ভালো চাও তো চণ্ডজীকে খবর পাঠাও, না হলে তোমার মকুলের দশা কোন দিন রঘুদেওজীর মতো হবে।'

কিন্তু খবর তাঁকে দেয় কে? যে চিঠি বইবে সে রণমল্লের লোক, আপনার লোক দিয়ে সে রাজ্যটা ভরিয়ে রেখেছে, তার চর রানীর অন্দরে ঘুরছে, তার অনুচর সর্দারের বাসায়-বাসায়, গ্রামে-গ্রামে, প্রজাদের ঘরে-ঘরে, পাঠশালায়, মন্দিরে, মঠে! কে কোথায় কী করছে, কী বলছে সব খবর পাচ্ছে সেই পেটমোটা

মাড়োয়ারী রাজা রণমল্ল ডাকাতদের সর্দার, চোরের শিরোমণি। নগরের ফাটকে-ফাটকে কেল্লার বুরুজে-বুরুজে তার চেলারা সব থানা বসিয়ে পাহারা দিচ্ছে দিন-রাত। রাগে ভয়ে দুঃখে রানী অস্থির হয়ে পড়লেন, চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন, চণ্ডকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি কী ভুলই করেছেন, আজ সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। রানী বুড়ি দাই-এর দুই পা জড়িয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, ‘হায়, আমার কী হবে?’ যে রানী একদিন তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়েছিলেন, আজ তাঁকে পা জড়িয়ে কাঁদতে দেখে বুড়ির চোখে জল এল। সে রানীকে শান্ত করে বললে, ‘আমি খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি; কিন্তু রানীমা, তুমি খুব সাবধানে কাজ করবে যেন আমাদের মনের কথ কেউ না জানতে পারে। তোমার বাপ শুনতে পেলে বড়ো বিপদ হবে, তার মুঠোর ভিতরে এখন সমস্ত রাজ্য, সে যদি গলা টিপে তোমার মকুলকে মেরে ফেলে, তবে ভয়ে কেউ একটি কথাও বলবে না।’

রানীর সঙ্গে কথা ঠিক করে দাই যেখানে বুড়ো রণমল্লটা সন্ধ্যাবেলা একটা ঘরে নিজের মতো মোটা একটা গের্দা ঠেস দিয়ে একরাশ মোহর গুনে-গুনে চটের থলিতে ভরে-ভরে রাখছেন ঠিক বড়োবাজারের মাড়োয়ারী এক-একটা মহাজনের মতো, সেইখানে আস্তে আস্তে এসে উপস্থিত হল। দাইকে হঠাৎ আসতে দেখে বুড়ো মোহরগুলো দুই থাবায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ‘তবে— তবে অসময়ে কী মনে করে?’

‘আজ্ঞে একটু সামান্য কাজ ছিল, যদি এখন ব্যস্ত থাকেন তো পরে আসব।’

রণমল্ল দাইকে ভয় করতেন, ঠিক দপ্তরখানার দপ্তরি যেমন তার মনিবকে ভয় করে। রাজ্যের সবাই রণমল্লের ভয়ে সারা কিন্তু রণমল্ল কাঁপেন দাইয়ের ভয়ে; তাই তিনি তাড়াতাড়ি দাইকে বললেন, 'না না, আগে তোমার কাজটাই সেরে নিই।'

দাই তখন বললে, 'আজ্ঞে, মকুলজীর একটু ফরমাস আছে, তার কবুতর পালবার শখ হয়েছে, তাই হুজুরের কাছে দরবার করতে এসেছি!'

'মকুলজী পায়রা ওড়াবেন' বলেই বুড়ো হোঃ হোঃ করে খানিক হেসে বললেন— 'তা ভালো, এসব শখ ভালো— পায়রা ওড়ান, ছাগল পালুন, এতে আমার আপত্তি নেই; ঘোড়া চড়া, তলোয়ার খেলা এগুলো ছাড়লেই বাঁচি, রাজার ছেলে ও-সব কেন? খান দান ঘুড়ি ওড়ান, সুখে থাকুন আর'— দাই বলে উঠল— 'আর রাজার ছেলের দাদামশাই বুড়ো মাড়োয়ারী সিংহাসনে বসে কেবল মোহরের তোড়া বাঁধুন?'

ঠিক বলেছ দাই, আমি তোমার উপর খুশি আছি; মকুলকে তুমি এরকম পায়রা আর ঘুড়ি দিয়ে ভুলিয়ে রাখ আর দুটো বছর, তারপর দেখা যাবে সিংহাসন আমার কাছ থেকে কেমন করে এরা কেড়ে নয়! এই নাও'— বলেই একটা মোহর বুড়ো অনেক কষ্টে থলি থেকে বের করে দাইয়ের হাতে দিতে গেলেন।

দাই হাত জোড় করে বলল, 'আপনার মোহর আপনার কাছেই থাক, মকুলজীর কবুতর কেনবার পয়সার অভাব নেই।'

'হ্যাঁ, তা কি আর আমি জানিনে! তার মায়ের হাতে অনেক টাকা আছে, তা যাও তোমরাই তবে কবুতর জোড়ার দাম দিও। প্রজাদের খাজনা অনেক

বাকি পড়েছে এখন আমার হাতে একটি পয়সাও নেই'— বলেই বুড়ো আবার টাকা গুনতে লাগলেন। দাই একটা মস্ত সেলাম করে সেখান থেকে চলে গেল।

কেল্লার ছাদের এক কোণে পাথরের একটা টানা বারাণ্ডায় কার্নিস খানিক ছায়া ফেলেছে, তারই তলায় একটি বাঁশের খাঁচায় দুটি পায়রা সকালবেলার দিকে চেয়ে গলা ফুলিয়ে চুপটি করে বসে আছে, এখনি মকুল এসে খাঁচাটি খুলে আকাশের আলোর মাঝে তাদের ছেড়ে দেবে এই আনন্দে তাদের শাদা রঙের ডানা দুখানি থেকে-থেকে উল্‌সে উঠছে। এমন সময় মহারানীর সঙ্গে দাই এসে পায়রা দুটির ডানার নিচে দুখানি ছোটো চিঠি বেঁধে দিয়ে আস্তে-আস্তে আবার খাঁচার দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

তখনো সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পড়েনি, রাজকুমার মকুল নরম বালিসের উপরে মাথাটি রেখে একটি হাত পুবের জানালার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে মুঠোর এক টুকরো কাগজ ধরে। রানী এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে কোলে করে দাইয়ের কাছে দিয়ে বললেন, 'তুই এখনো ঘুমচ্ছিস? বেলা হয়েছে, কখন আর তোর দাদার কাছে পায়রার গলায় বেঁধে চিঠি পাঠাবি?' মকুল কোনো কথা না বলে দাইকে টানতে-টানতে এক ছুটে ছাদে এসে উপস্থিত হল। দাই হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, কই, মকুলজী তুমি যে বলেছিলে চিঠ্‌ঠি লিখে রাখবে, তা কই।' মকুল হাতের মুঠো খুলে দেখালে সেই হিজি-বিজি লেখা কাগজখানি। দাই কাগজটি এপিঠ-ওপিঠ উল্‌টে পাল্‌টে বললে, 'বহুৎ আচ্ছা, চিঠ্‌ঠি পড়ো তো শুনি কুমার সাহেব কী লিখেছ।' মকুল জানত কেমন করে চিঠি পড়তে হয়, তাই সে গম্ভীর হয়ে আরম্ভ করলে ঃ

দাদা, আমি তোমার ছোটো ভাই, তোমার জন্য কাঁদছি, একবার এসো, খুব খেলা হবে; কবুতর দুটো চিঠি নিয়ে যাচ্ছে জবাব দিও। এদের ছানা হলে তোমায় একটা দেব। আমি খুব ভালো আছি। ইতি—

মকুল

তোমার ছোটো ভাই

পুঃ— মা আর দাই তোমার জন্য খালি কাঁদে।

'চিঠি যেমন হতে হয়'— বলে দাই কাগজখানা নিয়ে বেশ করে মুড়ে বললে, 'তবে এখন কোন দাদাকে চিঠিখানা পাঠাতে চাও বল।' এইবার মকুল মুশকিলে পড়ল, বড়োদাদা আর ছোটোদাদা দুই দাদার মধ্যে বেছে নেওয়া তার পক্ষে শক্ত হল, দুইজনকেই সে সমান ভালোবাসে, দুইজনকেই সে চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতে চায়। কিন্তু হায়, চিঠি তার একখানি বৈ নেই! ভাবনায় তার মুখ শুকিয়ে গেল, তখন রানী আস্তে আস্তে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'এক কাজ কর, আধখানা চিঠি বড়োদাদাকে, আর আধখানা ছোড়দাদাকে পাঠিয়ে দে।' তাই হল। প্রথম টুকরো ছোড়দাদার আর বাকিটুকু বড়দাদার জন্যে ছিঁড়ে মকুল দাইয়ের হাতে দিল।

শাদাডানা দুই পায়রা সেই দু-টুকরো কাগজ গলায় বেঁধে আকাশে উড়ল, ডানার তলায় লুকানো রইল তাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে চণ্ডের কাছে রানী আর দাইয়ের দুখানি চিঠি। সোনামাখানো মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে দুটি পাখি ছোটো-বড়ো দুজনের ডাক বয়ে, সূর্যের আভা আকাশ রাঙিয়ে তাদের দুজোড়া ডানার পালকে এসে ঠেকেছে শাধা পালে হাওয়ার মতো। চিতোরের কেল্লায় বন্দী অসহায় মকুল আর তার মায়ের ডাক সকালের সোনায়

মাখা, দুপুরের রোদে পোড়া, সন্ধ্যার মেঘ আর আলোর চিত্র-বিচিত্র দিনের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নীল-গোলা অন্ধকার আকাশ পার হয়ে যেদিন মাণ্ডুর কেল্লায় চণ্ডের কাছে এসে পৌঁছল, সেদিন চণ্ড সব দুঃখ সব অপমান ভুলে অনেক দিনের কোণে-রাখা তলোয়ার আর একবার কোমরে বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন।

আজ তিনদিন ধরে একটা প্রকাণ্ড ঝড় রাজস্থানের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে— তারই মধ্যে থেকে এক-একবার সকালে সন্ধ্যায় সূর্যদেব দেখা দিচ্ছেন রক্তমূর্তি! চণ্ড যখন চিতোর ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনশো ভীল তাঁর সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আজ তারা চণ্ডের হুকুম নিয়ে চিতোরে আবার ফিরছে ঝড়-জল-বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে।

চিতোর থেকে খানিকটা দূরে গো-সুন্দ নগর, পাহাড়ের উপর একটা মজবুত কেল্লা আর তাকেই ঘিরে ছোটো-ছোটো বাড়ি পাহাড়ের নিচে অনেকখানি ঘন ঘন, তার মধ্যে দিয়ে ছোটো-ছোটো নদী বয়ে চলেছে, এই বনে চণ্ড তাঁর দলবল নিয়ে লুকিয়ে রইলেন! কথা ঠিক হল যে, মহারানী সুন্দেশ্বরীর পুজো দেবার ছল করে মকুলজীকে নিয়ে এইখানে এসে দেওয়ালীর দিন চণ্ডের সঙ্গে মিলবেন।

এদিকে চণ্ডের অনুচর যত ভীল মেবারের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে রটিয়ে দিয়েছে— রণমল্ল মকুলজীকে মেরে ফেলেছে। লোকে সব গ্রামে-গ্রামে মাঠে-ঘাটে এইসব গুজব শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠে লাঠি-তলোয়ার তীর-ধনুক নিয়ে চিতোরের দিকে দল বেঁধে চলেছে— যদি একথা সত্যি হয় তবে সেই পেটমোটা মাড়োয়ারের রাজা রণমল্লকে আর আস্ত রাখবে না। রণমল্ল এই খবর পেয়ে ভয়ে কাঁপছেন, কী উপায় করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না! সেই সময় একদিন দাই এসে

তাঁকে বললে, ‘হুজুরের মেজাজ ভালো বোধ হচ্ছে না, একটা খবর শুনে আমারও ভয়ে গা কাঁপছে; শুনছেন দেশের লোক তাদের রানা মকুলকে দেখবার জন্যে লাঠি-সোটা নিয়ে এই দিকে আসছে।’ রণমল্ল খবরটা খুব ভালো করেই শুনেছিলেন তবু দাইকে ধমকে বললেন, ‘যাও-যাও, মাড়োয়ারের রাজা আর মেবারের এখনকার সর্বেসর্বা দু-দশগাছা লাঠির ভয়ে কাঁপে না, আর কিছু খবর থাকে তো বলো।’

দাই তখন চুপি-চুপি বললে, এবারে যে-দল আসছে বড়ো শক্ত দল, মেবারের রাজপুতকে আপনি চেনেন না, এই বেলা যা হয় উপায় করুন।’

রণমল্ল মনে ভয় কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে বলে উঠলেন, ‘কী উপায় করতে হবে শুনি?’

—দাই বললে, ‘মকুলজীকে একবার গ্রামে গ্রামে শিকার খেলার জন্যে পাঠিয়ে দিন। লোকে দেখুন তাদের রানা বেশ সুখে বেঁচে আছে আর খেলে বেড়াচ্ছে। তাহলেই তারা ঠাণ্ডা হবে আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না।’

রণমল্ল খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, ‘মন্দ পরামর্শ নয়, কিন্তু হাতিয়ার বেঁধে গ্রামে-গ্রামে শিকার খেলে বেড়ানো তো হতে পারে না, শিকার থেকে লড়াই বাধতে কতক্ষণ? অন্য কিছু উপায় থাকে তো বল।’ ‘তবে রানীমা আর মকুলজীকে পাল্‌কি চড়িয়ে গ্রামে-গ্রামে দেবতাদের পুজো দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিন, কাজ একই হবে।’ এ পরামর্শটা রণমল্লের মনোমতো হল, দাই রানীকে আর মকুলজীকে পাল্‌কিতে চড়িয়ে চিতোরের কেল্লা পার করে দিয়ে এল। যাবার সময় মকুল বললে, দাই মা, তুমি যাবে না?’

'না জী, বাঘ ধরবার সেই ফাঁদটা শেষ করে তবে আমি তোমার কাছে যাব— বলেই দাই চিতোরের কেল্লায় ফিরে এল।

গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালীর আজ ভারি ধুম মহারানী রানাজীকে নিয়ে কেল্লায় এসেছেন, খুব ঘটা করে আজ সুন্দেশ্বরীর পুজো দেওয়া হবে। ঘরে ঘরে আজ প্রজারা পিদিম জ্বালিয়েছে, রাস্তায়-রাস্তায় দোকানীরা ঝাড়লণ্ঠন ছবি আয়না দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে লোকের গায়ে কেবল গোলাপজলের পিচকিরি দিচ্ছে। শহরের ছেলেগুলো রাস্তার মাঝে তুবড়ি পুড়িয়ে ছুঁচো-বাজি ছেড়ে মকুলজীর সঙ্গে যে-সব ঘোড়সওয়ার এসেছে তাদের ঘোড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখছে। ছেলে বুড়ো সবাই মিলে হাউই উড়িয়ে চরকি ঘুরিয়ে ফুলঝুরি, রংমশাল, বোমা দোদমা, ভুঁইপটকা চিনে-পটকা খুব খানিকটা আমোদ করে নিচ্ছে।

মকুলের আজ আনন্দের সীমা নেই! এক সোনার সাজ-পরা কালো ঘোড়ায় চড়ে তিনি শহরময় ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালীর আলো দেখে বেড়াচ্ছেন। আর রানীমা, কেল্লার ছাদে একলা তিনি চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন, যত রাত বাড়ছে ততই তাঁর মনে হচ্ছে চণ্ড বুঝি এলেন না। আজ যে এই গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালীর রাতে তাঁর দলবল নিয়ে আসবার কথা, কিন্তু কই? দেখতে-দেখতে শহরের আলো নিবে এল; মকুল তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে কেল্লায় এলেন, কিন্তু চণ্ডের আসবার কোনো লক্ষণ নেই, এই রাত্রের মধ্যে তাঁদের চিতোরে ফিরতে হবে, আর তো সময় নেই। রানী অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন, দুই চোখের জল তাঁর বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগল।

এদিকে সুন্দেশ্বরীর মন্দির থেকে ঢং-ঢং করে রাত দশটার ঘণ্টা পড়ছে, লোকজন প্রস্তুত হয়ে চিতোরে যাবার জন্যে পালকি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, মকুল

রানীকে ডাকছেন যাবার জন্যে কিন্তু রানীর পা আর উঠছে না, তাঁর বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ির ঘা দিয়ে অন্ধকারের ঘণ্টা বাজছে এক, দুই, তিন, চার। রাত দশটার ঘণ্টা বেজে থেমেছে— অন্ধকার আকাশ বাতাস তারই শব্দের রেশায় এখনো রী-রী করে কাঁপছে, ঠিক সেই সময় পাহাড়ের নিচে বনের মাঝ দিয়ে দশটা হাউই আগুনের সাপের মতো ফোঁস করে ফণা ধরে আকাশে উঠে দপ করে আলোর ফুল হয়ে আকাশময় ছিটিয়ে পড়ল— আলোয় চারিদিক দিন হয়ে গেছে, শহরের লোক আশ্চর্য বাজি দেখতে হৈ-হৈ করে রাস্তায় ছাদে যে যেখানে পেরেছে বেরিয়ে এসেছে! রানী মকুলের হাত ধরে বললেন, 'সময় হয়েছে, আর দেরি না চলো।' মকুলের ইচ্ছা আরো খানিকটা ছাদে দাঁড়িয়ে বাজি দেখেন। কিন্তু রানী তাঁকে জোর করে ধরে পাল্‌কিতে ওঠালেন, আকাশের হাউই তাঁদের মাথার উপরের লাল আলোর পুষ্পবৃষ্টি করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল! মকুল পাল্‌কি থেকে আবার কখন হাউই ওঠে দেখবার জন্য মুখ বাড়িয়ে বসে রইলেন কিন্তু আকাশ যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রইল।

মকুল রাত্রির মধ্যে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে-থেকে ঘুমিয়ে পড়েছেন, রানীর পাল্‌কি নির্জন মাঠের পথে আস্তে-আস্তে চলেছে, মাটির উপরে আটটা পাল্‌কি-বেহারার খসখস পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ রানীর কানে আসছে না। রানী অন্ধকারের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রয়েছেন। একবার মনে হল যেন একদল লোক খুব দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল, একবার দেখলেন যেন রাস্তার ধারে একজন কে বল্লম হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে— পাল্‌কি কাছে আসতেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। গো-সুন্দ নগরে সেই দশটার তারাবাজি দেখে রানী চণ্ড এসে পৌঁচেছেন বুঝেছিলেন, তারপর থেকে কিন্তু

চণ্ডকে স্পষ্ট করে দেখা এখনো তাঁর ঘটে ওঠেনি। চণ্ড যে তাঁর কাছাকাছি আছেন, সেটা কেবল এই ছায়া-ছায়া রকম দেখছিলেন!

রাত গভীর— পাল্‌কি চিতোরের কাছাকাছি এসে পড়েছে, দূর থেকে কেল্লার দেয়াল আকাশের গায়ে কালো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড় বেয়ে রানীর পাল্‌কি কেল্লার ফটকের দিকে উঠে চলল কিন্তু তখনো চণ্ডের কোনো দেখা নেই। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কী তলোয়ারের ঝনঝন কিছুই শোনা যাচ্ছে না; রানীর বুক কাঁপছে, তাঁর চোখের সামনে কেল্লার ফটকের বড়ো দরজা দুখানা আস্তে-আস্তে খুলে গেল যেন একটা রাক্ষস অন্ধকারে মুখটা হাঁ করলে। তারপর আস্তে-আস্তে রানীর পাল্‌কি কেল্লার মধ্যে ঢুকল, রানী একবার পাল্‌কি থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে পিছনের দিকে দেখলেন ফটকের সামনে একদল ঘোড়সওয়ার খোলা তলোয়ার মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর সঙ্গে কেল্লায় প্রবেশ করলে, তাদের সর্দার প্রকাণ্ড এক কালো ঘোড়ায়— মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার কালোসাজ, নিমেষের মধ্যে এই ছবিটা রানী দেখতে পেলেন; চণ্ডকে চিনতে তাঁর বাকি রইল না। তারপর ‘জয় মকুলজী কি জয়! জয় চণ্ডকী কি জয়!’ শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে উঠল, অমনি চিতোরে চোটো-বড়ো ছেলে-বুড়ো তলোয়ার খুলে রাজপথে রানীর পাল্‌কির চারিদিক ঘিরে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলল। যত মাড়োয়ারী যারা এত বুক ফুলিয়ে রাজাগিরি ফলাচ্ছিল, সব আজ চণ্ডের নাম শুনেই ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়ে লুকোল, কারো এমন সাহস হলো না যে রণমল্লকে গিয়ে খবরটা দেয়। আর খবর দিয়েই বা কী হবে? দেওয়ালীর রাতে খুব করে সিদ্ধি খেয়ে রণমল্ল খাটিয়ায় পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। দাই একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে তাঁকে আচ্ছা করে বেঁধে ছাদের উপর থেকে তামাশা দেখতে গেল। রণমল্লের

ভোজপুরী আর মাড়োয়ারী দারোয়ানগুলো ঢাল তলোয়ার বেঁধে তালপাতার সেপায়ের মতো কেবল হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, লড়াই দেবার আর সাধ্য হল না।

চণ্ড জোর করে তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোলমালে রণমল্ল জেগে উঠে দেখেন তাঁর চারিদিকে খোলা তলোয়ার, নিজের হাত-পা বাঁধা; তাঁর সাহসও ছিল জোরও ছিল; হাজার হোক তিনি মাড়োয়ারের রাজা, আর তলোয়ার দেখে তাঁর সিদ্ধির ঘোরও কেটে গেছে। তিনি পিঠে বাঁধা খাটিয়াকানাসুদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে চণ্ডকে বললেন, 'আমার বাঁধন খুলে দাও, তারপর দেখা যাবে কে জেতে কে হারে। তুমি বীর, রাজা ছেলে— আমিও একটা দেশের রাজা; আমাকে জানোয়ারের মতো বেঁধে মারা তোমার উচিত হয় না।'

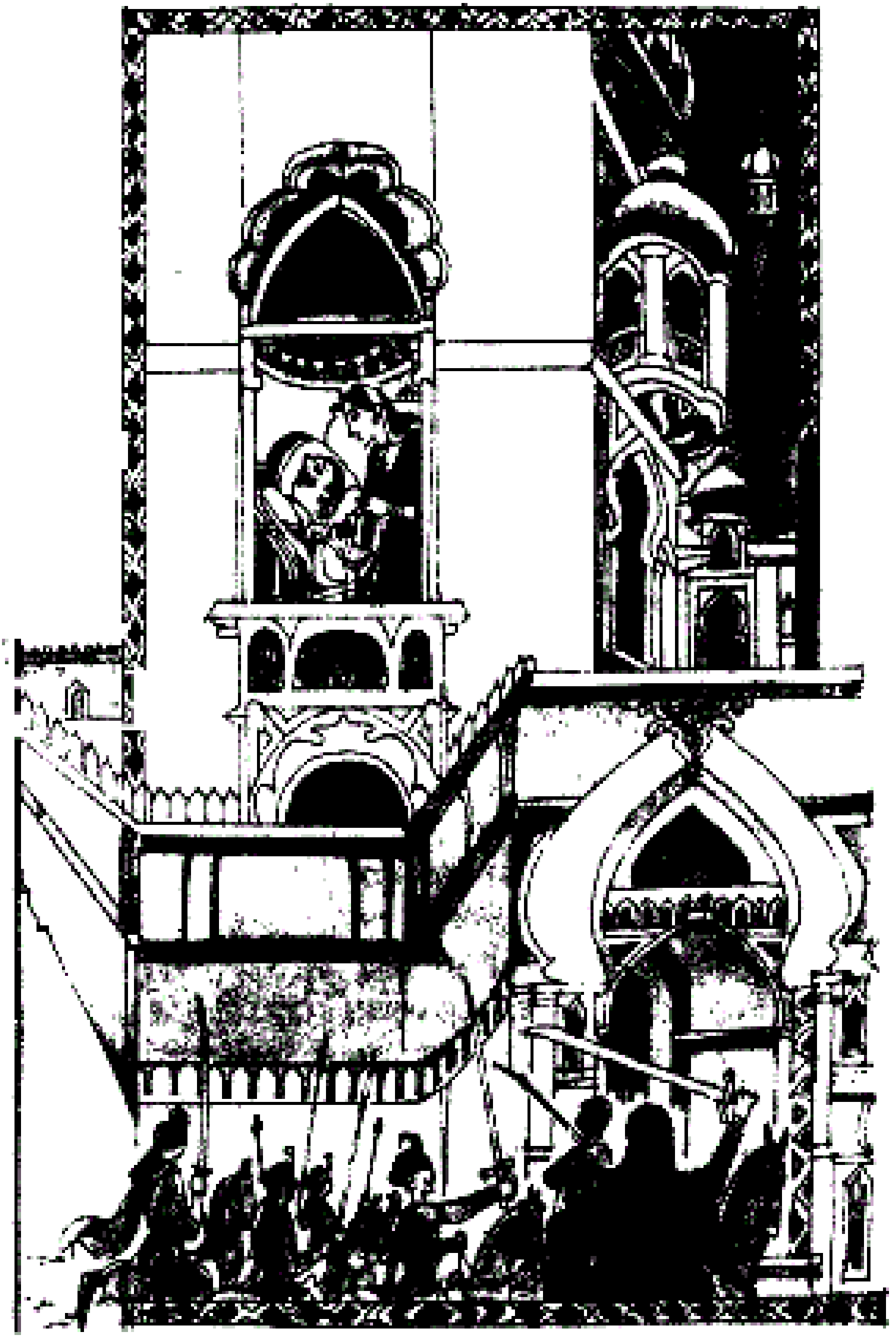

চণ্ড রণমল্লের বাঁধন খোলবার জন্যে ঘরে ঢুকবেন এমন সময় দাই ছুটে এলে বললে, 'সাবধান, ওকে একা পুড়ে মরতে দাও, সরে যাও, না হলে সবাই মরবে।' দুম করে একটা ভয়ংকর আওয়াজ হয়ে ঘরের কোণে একরাশ বারুদ জ্বলে উঠল, তারপর দাউ-দাউ করে ঘরখানায় আগুন লেগে গেল! ছুঁচো-বাজি দিয়ে ঘরখানা দাই যে কখন ভর্তি করে রেখেছিল কে জানে? ছুঁচোর মতো রণমল্ল পুড়ে মোলেন— 'খুলে দে! খুলে দে!' বলে চিৎকার করতে করতে। যাকে রাজবাড়ির দাসী বলে তিনি ঠাউরে ছিলেন, তারই হাতের বাঁধা দড়ির বাঁধ শেষ পর্যন্ত আগুনের নাগপাশের মতো তাঁকে জড়িয়ে রইল।

কোথায় মেবার মাড়োয়ার দুটো দেশ রণমল্ল দখল করে বসবেন, না এখন তাঁর মাড়োয়ারের সিংহাসনটা পর্যন্ত মেবারের রানার হাতে এল। তাঁর ছেলে যোধরাও বাপের সিংহাসন হারিয়ে এখন সামান্য গুটিকতক সেপাই নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে চলল, অনেক দূরে লুনী নদীর ও-পারে।

মহাবীর হরোয়া শংকল রাজর্ষি— লুনী নদীর ও-পারের সমস্ত পাহাড় নদী বন তাঁর রাজত্ব। তাঁর নামে সবাই মাথা নোয়ায় এমনি তাঁর বীরত্ব, এমনি তাঁর দয়া, তাঁর হুকুম অমান্য করে রাজস্থানে এমন লোক নেই। বিপদে যে পড়েছে তাকে উদ্ধার করা, দুঃখীর দুঃখ মোচন, অনাথকে আশ্রয় দেওয়াই তাঁর কাজ, তাঁর যত অনুচর সবাই সন্ন্যাসী বীর, গাঁজাকোর নয়, কাজের মানুষ। কেউ কারুর উপর অন্যায় অত্যাচার করলে তাদের হাতে নিস্তার নেই, বনের ভিতর পাহাড়ের গুহায় তাদের সব কেল্লা, সেখানে জালা-জালা টাকা পোঁতা আছে, লোকে চাইলে সেই টাকা দিয়ে তারা তাদের দুঃখ ঘোচায়। মাটির নিচে বড়ো বড়ো ঘর, সেখানে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র লুকোনো থাকে, কেউ বিপদে পড়ে তাদের কাছে এলে সেই

অস্ত্র দিয়ে তারা তার সাহায্য করে, এমনি দলের রাজা তিনি হরোয়া শংকল। লুনী-নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যোধরাও রাতদুপুরে এসে তাঁরই আশ্রয় চাইলেন; যোধরাও জানতেন চণ্ডও ইচ্ছে করলে এখানে এসে গোল-মাল করতে পারবেন না।

হরোয়া শংকল আদর করে যোধরাওকে বসালেন; তাঁর ছোটো ঘর, রাজকুমারের সঙ্গে অনেক সেপাই, কাজেই সবাইকে গাছতলায় বসাতে হল, সন্ন্যাসী রাজা একটু ভাবিত হলেন এত রাত্রে এত লোকের খাবার কেমন করে যোগাবেন, লোকেরাও অনেক পথ চলে এসে খিদেয় কাতর হয়ে পড়েছে! রাজর্ষি তাঁর দলবলকে ডেকে সকলের আহারের সুবন্দোবস্ত করে দিতে বললেন, কিন্তু ঘরে তাঁর একটু খুদও নেই, সেদিনের যা-কিছু চাল ডাল সব তিনি অতিথিদের বিলিয়ে দিয়েছেন। বিপদে পড়ে চেলারা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে রাজর্ষি বললেন, ‘অতিথিকে তো খেতে দিতে হবে, এস দেখি ঘরে কী আছে।’ ঘরের এক কোণে সন্ন্যাসীদের কাপড় রাঙাবার জন্য একরাশ মূঁজলতা বোঝা বাঁধা ছিল, রাজর্ষি সেইগুলো দেখিয়ে বললেন, ‘যাও, এইগুলো রেঁধে আনো।’

রাঁধুনী এক সন্ন্যাসী, সে হেসে বললে, ‘প্রভু, এইবার অতিথি সেবার ঠিক বন্দোবস্ত করেছেন। যে মুখে ঠাকুরের ভোগ খাবে সেই মুখে কাল সকালে দেশে ফিরে কাউকে এবার আর ঠাকুরের অতিথি সেবার নিন্দে করতে হবে না, এইবার ঠিক হয়েছে!’

রাজর্ষি হেসে বললেন, ‘আজ আমি নিজের হাতে রাঁধব, তোমাদের সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে, নিমন্ত্রণ করছি, সব চেলাদের ডাক দাও।’

গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে রান্না শুরু হল, রান্নার গন্ধে বন আমোদ করলে কিন্তু তরকারি দেখে অবধি চেলাদের আজ আর মোটেই খিদে নেই, যদিও সকালে এক-এক মুঠো ছোলা ছাড়া এ-পর্যন্ত কারো পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু প্রভুর নিমন্ত্রণ কারো অগ্রাহ্য করার যো নেই। রান্না শেষ হলে সবাই অতিথিদের জন্যে পাতা পেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আগে যোধরাও আর তাঁর লোকজনদের মোটা আটার রুটি আর মূঁজলতার সেই তরকারি খাইয়ে রাজর্ষি সব চেলাদের নিয়ে খেতে বসলেন, কেবল সেই রাঁধুনি চেলাকে অনেক ডাকাডাকি করেও কেউ আনতে পারলে না, সে কম্বল মুড়ি দিয়ে জঙ্গলের কোনখানে যে লুকিয়ে রইল তার আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। খাওয়া শেষ হলে সবাই রাজর্ষির রাঁধা তরকারির সুখ্যাতি করতে-করতে যে যার জায়গায় শুতে গেল। মূঁজশাকের এমন যে রান্না হয় তারা কেউ জানত না, এবার থেকে রোজ এই তরকারি দিয়ে তারা রুটি খাবে এইসব বলাবলি করছে এমন সময় সেই রাঁধুনী এসে উপস্থিত! সবার মুখে তরকারির তারিফ শুনে তার আর আপসোসের সীমা রইল না! সে ভেবেছিল ওই রঙ করবার পাতাগুলো খেয়ে সবাই মাথা ঘুরে মরবে কিন্তু দেখলে সবাই দিব্বি পেট ভরিয়ে আরামে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমতে লেগেছে, কেবল শীতের রাতে খিদের জ্বালায় সে-ই মরছে কেঁপে।

শীতের রাত সহজে কাটতে চায় না, রাঁধুনী ঠাকুরটিকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে তবে সে রাত পোহাল। সকালে উঠে সে একখানা কুড়াল নিয়ে রান্নার কাঠ কাটতে চলেছে এমন সময় একজন বুড়ো মাড়োয়ারী সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা; পাহাড়ের ঝরনার ধারে সে হাত-মুখ ধুচ্ছে, তার দাঁড়ি-গোঁফ সব লাল রঙের ছোপ-ধরা। কাল সন্ধ্যায় যার দাড়ি ছিল শাদা, আজ লাল হয়ে গেল। এ ব্যাপার

দেখে রাঁধুনী ঠাকুরটি আর হাসি রাখতে পারলে না, হোঃ হোঃ করে হাসতে-হাসতে সঙ্গীদের কাছে এই মজার খবরটা দিতে এসে দেখে যত পাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা ছিল তারা নিজের-নিজের দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে আর এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছে সবার দাড়ি-গোঁফে লাল রঙের ছোপ। ইতিমধ্যে রাজর্ষি বেরিয়ে এলেন তাঁর কিন্তু শাদা তাড়ি ধবধব করছে। মূঁজপাতার যে রঙ লেগেছে এটা কারুর মনে এল না; দাড়িতে রক্ত কোথা থেকে লাগল এই ভেবে সবার যখন মুখ শুকিয়ে এসেছে তখন রাজর্ষি সবাইকে অভয় দিলেন, 'নির্ভয়ে থাকো, তোমাদের সুখের সূর্য উদয় হতে আর দেরি নেই; দেখো না এখনি তার রাঙা আলো তোমাদের মুখে এসে পড়েছে; এখন কিছুদিন এইখানে বিশ্রাম করো, তোমাদের রাজত্ব ফিরে পাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।'

সেইদিন কাঠ কেটে রাঁধুনী ঠাকুর রাজর্ষিকে আর এক বোঝা মূঁজপাতা এনে দিয়ে বললে, 'ঠাকুর, আমাকে আজ একটু সেই তরকারি রেঁধে দিতে হবে'। রাজর্ষি হেসে বললেন, 'তোমার কালো দাড়িতে লার রঙের ছোপ তো খুলবে না, দাড়ি আগে পাকুক তবে একদিন মূঁজশাকের চচ্চড়ির ছোপ ধরিয়ে দেওয়া যাবে, আজ ভালো করে অন্য তরকারি দিয়ে অতিথি খাওয়াবার বন্দোবস্ত করো।' রাঁধুনী ঠাকুরটি খেতে যেমন মজবুত রাঁধতেও তেমনি, আর রাজ্যের আজগুবি গল্প তার কাছে; যোধরাও আর সঙ্গীদের বেশ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটতে লাগল, বনে আছেন মনেই হতো না।

এদিকে হরোয়া শংকলের হুকুম চণ্ডের কাছে পৌঁছল— যোধরাওকে যেন মাড়োয়ারের সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়ে ঝগড়াঝাঁটি সব মিটিয়ে দেওয়া হয়— এর উপর কোনো কথা নেই। চণ্ডের দুই ছেলে মুঞ্জজী আর কণ্ঠজী মাড়োয়ার শাসন

করছিলেন; তাঁদের উপর হুকুম হল যে হরোয়া শংকল কিংবা তাঁর কোনো লোক যোধরাওকে সঙ্গে নিয়ে আসামাত্র মাড়োয়ারের সিংহাসন যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হরোয়া শংকল দূতের মুখে এই খবর পেয়ে নিজেই যোধরাওকে সঙ্গে নিয়ে মেবারে চললেন, সেখান থেকে চণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে মাড়োয়ার যাবার কথা। ঠিক সময়ে সবাই মেবারে পৌঁছে চণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে যোধরাওর রাজত্বে মুন্দরের কেল্লার দিকে চললেন; যোধরাও তখন ছেলেমানুষ— একরাত্রে সবাই মাঠের মধ্যে তাঁবু গেড়ে আছেন এমন সময় একটা বুড়ো মাড়োয়ারী যোধরাওর কানে কানে বললে, 'দেশে তো এসে পড়েছি, তবে এখন আর চুপ করে থাকা কেন? চলুন, আজ রাত্রেই গিয়ে কেল্লাটা দখল করে বসি, নিজের সিংহাসন পরের কাছ থেকে চেয়ে না নিয়ে জোরসে কেড়ে নেওয়াই ভালো, কী বলেন? যোধরাও এ কথায় সায় দিলেন, আস্তে-আস্তে মাড়োয়ারী সৈন্য সব মুন্দরের দিকে বেরিয়ে গেল।

চণ্ড আর হরোয়া শংকল এ খবর কিছুই জানেন না, সকালবেলা শিবির থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় দেখলেন দূর থেকে এক ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে— তার মাথার পাগড়ি খোলা, বুকের কাপড়ে রক্তের দাগ। সওয়ার যখন ছুটে এসে চণ্ডের কাছে দাঁড়াল তখন চণ্ড তাঁকে নিজের ছেলে কণ্ঠজী বলে চিনতে পারলেন। হরোয়া শংকল তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন, অমনি কণ্ঠজীর প্রাণ বেরিয়ে গেল। কে তাঁকে এমন করে মারল এই দেখবার জন্যে তাঁরা এদিক-ওদিক দেখছেন এমন সময় যোধরাও ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার অপরাধ যদি হয়ে থাকে তো ক্ষমা করবেন। বাপের সিংহাসন আমি কারু কাছে ভিক্ষা বলে চেয়ে নিতে পারলুম না, নিজের জোরে

ফৌজ পাঠিয়ে দখল করেছি, লড়াই শেষ হয়ে গেছে। চণ্ডজীর হাতে আমার বাপ পশুর মতো মারা পড়েছে তারই ধার তাঁর দুই ছেলেকে যুদ্ধে বীরের মতো মেরে শোধ দিলেন, এতে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে তো শাস্তি দিন।'

চণ্ডের মুখে কোনো কথা সরল না। হরোয়া শংকল খানিক ঘাড় হেঁট করে রইলেন, তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'যোধরাও ভুল করেছ, চণ্ডের কোনো দোষ ছিল না, তুমি বালক বলে এবার তোমায় শাস্তি দিলেম না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো, আর কখনো মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। আর এই মাটিতে যেখানে এই বীর কণ্ঠজী পড়ে রয়েছেন, এই পর্যন্ত মেবারের রাজ্যের সীমা ঠিক হল, এরপর থেকে তোমার রাজত্ব।'

চণ্ড চোখের জলের মধ্যে দিয়ে দেখলেন যেখানে তাঁর কণ্ঠজী প্রাণশূন্য দেহে পড়ে রয়েছে সেখানে সকালের আলোতে সমস্ত মাঠজুড়ে সোনার ফুলের মতো আঁওলার কচি ফুল ফুটে উঠেছে। তিনি হরোয়া শংকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই আঁওলার ফুলই যেন শান্তির ফুল হয়, যত দূর এই ফুল ফুটবে ততদূর যেন মেবারের রাজ্য এইটেই সবাই বলে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, প্রভু আমাকে এখন আপনার সঙ্গী করে লুনী নদীর পারে তপোবনে আশ্রয় দিন।'

রাজর্ষি বললেন, 'তথাস্তু।'

রানা কুম্ভ

রানা মকুলের দুই খুড়ো ছিলেন— চাচা আর মৈর। যদিও দুজনে রাজার ছেলে, কিন্তু তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে; সেইজন্য রানাদের চেয়ে তাঁরা মানে খাটো! মেবারের সিংহাসনেও বসবার তাঁদের কোনো উপায় ছিল না। আর সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি— মুকুল তাঁদের যথেষ্ট জমিজমা দিয়েছিলেন। মকুলজী যদি তাঁর দুই চাচাকে কেবল রাজসভার শোভামাত্র করে রেখে চুপচাপ থাকতেন, তবে আর কোনো গোলই হত না; তা না, একদিন দুই কুড়োকে সাতশো করে সেপাইয়ের সর্দার বানিয়ে দিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে মকুল রানা একটু মজা দেখতে চাইলেন।

খুড়ো দুজনের কাজের মধ্যে ছিল দিবারাত্রি আফিং খেয়ে ঝিমানো। হঠাৎ সর্দার ব'নে গিয়ে লড়াইয়ে যেতে হলে, তাঁরা না-জানি কী বিপদেই পড়বেন— কোথায় থাকবে আফিং, কোথায় বা তামাক? দুধের পুরু সর, রাবড়ি, মালাই সেখানে তো পাওয়াই যাবে না; উল্‌টে বরং মাঠের হিম খেয়ে মরতে হবে!— মাদেরিয়ার ভীলদের হাঙ্গামা মেটাতে গিয়ে মকুল এই তামাশা দুই খুড়োকে নিয়ে শুরু করলেন। অনেক দিন বেশ আমোদে কাটল। তামাশার সঙ্গে সাতশো সেপাইয়ের সর্দারে মাসোহারা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভাইপোটিকে আমোদ দিতে দুই খুড়োর আপত্তি হল না; কিন্তু ঠাট্টা-তামাশা ক্রমেই একটু কড়া-রকম হতে লাগল। এমন কি, আফিংচি হলেও তামাশার খোঁচার দিকে চোখ বন্ধ করে ঝিমানো দুই খুড়োর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু ভাইপোর অনুগ্রহ ছাড়া বেচারাদের পেট চালাবার জন্য উপায় ছিল না; কাজেই মনের রাগ তাদের মনেই

জমা হতে লাগল! আর কোনো কোনো দিন মুখ ফুসকে বেরিয়েও আসতে শুরু করলে! এতে মকুলজীর আমোদ আরো বেড়ে চলল বই কমল না। লোককে নিয়ে তামাশা করার নেশা লখারানার মতো মকুলেরও কম ছিল না! একদিন দুই চাচা তাঁকে স্পষ্ট মুখের উপর শুনিয়ে দিলেন যে বাপের তামাশার ফলে তিনি যে সিংহাসন পেয়েছেন, নিজের তামাশার দোষে সেটা কোনদিন বা তাঁকে হারাতে হয়। চাচার মনের কথা এমন স্পষ্ট শুনেও মকুলের চোখ ফুটবল না। খুড়োদের ক্ষেপিয়ে তিনি তামাশা করেই চললেন।

সেদিন বনের মধ্যে একটা গাছে হঠাৎ রাত্রের মধ্যে রাঙা ফুল এতো ফুটে উঠেছে যে মনে হচ্ছে বনে কে আগুন ধরিয়ে গেছে। মকুল সেই গাছটা দেখিয়ে পাশের একজনকে গাছের নামটা শুধোলেন। সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'গাছের খবর আমরা রাখিনে রানাসাহেব!'

মকুল তাঁর দুই খুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, 'গাছটার নাম কী আপনারা জানেন চাচা?'

শাদা কথা কিন্তু দুই খুড়ো বুঝলেন, তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে কাজেই গাছের খবর তাঁদেরই কাছে পাওয়া সম্ভব— এইটেই রানা ইশারায় জানালেন। মা যেমনই হোক, সে তো মা, তাকে নিয়ে তামাশা কোন ছেলে সইবে! সেইদিনই দুই খুড়ো মকুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে সভা ছেড়ে শুকনো মুখে বিদায় হয়ে গেলেন। রানার দেওয়া সাজসজ্জা, অস্ত্র-শস্ত্র, টাকা-কড়ি লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া সব পড়ে রইল; কেবল একটি মা-হারা মেয়ে যাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দুই ভায়ে আপনাদের সব ভালোবাসা দিয়ে পুষেছিলেন, তাকেই কোলে

করে সেপাই সর্দার সবার মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেলেন— একেবারে বন ছেড়ে।

দুই খুড়োর উপর কতটা অন্যায় হয়েছে, মকুল তখন বুঝলেন। মাপ চেয়ে দুই কুড়োকে ফিরিয়ে আনতে লোকের পর লোক গেল, কিন্তু দুই খুড়ো আর ফিরলেন না! অনুতাপে মকুল সারাদিন দুঃখ পেতে থাকলেন। নিতান্ত ভালোমানুষ নিরুপায় দুই খুড়োর শুকনো মুখ তাঁকে আজ কেবলি ব্যথা দিতে লাগল। তিনি সন্ধ্যাবেলা শিবির ছেড়ে একা বনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন! সর্দারেরা রানার মনের অবস্থা বুঝে কেউ আজ সঙ্গে যেতে সাহস পেলেন না। সবাই তফাতে-তফাতে রইল। বনের তলায় আঁধার ক্রমে ঘনিয়ে এল, আকাশে আর আলো নেই, এ-সময়ে যখন চারিদিকে বিদ্রোহী ভীল, তখন রানাকে আর বনের মধ্যে একা থাকতে দেওয়া উচিত না ভেবে যখন সব সর্দার বনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, সে সময়ে মনে হল যেন অনেকগুলো শুকনো পাতা মাড়িয়ে অন্ধকারে কারা ছুটে পালাল। তারপরেই সর্দারেরা দেখলেন, সেই রক্তের মতো রাঙা ফুলগাছের তলায় রানা মকুল পড়ে রয়েছেন; বুকের দুই দিকে দুটো বল্লমের চোট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রানা সন্ধ্যার মালা জপ করছিলেন, এখনো তাঁর ডান হাতের আগায় মালা জড়ানো। রানার মতো রানা ছিলেন মকুল— মেবারে হাহাকার পড়ে গেল। সবাই বলতে লাগল, এ কাজ সেই দুটি খুড়োর না হয়ে যায় না। মাদেরিয়ার বনে বিদ্রোহীদের কেউ এসে যে রানাকে মেরে যেতে পারে এটা সবার অসম্ভব বোধ হল!

পায়ীগ্রাম থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপরে রাতকোটের কেল্লা। সেইখানে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে চাচা আর মৈর অতি কষ্টে এসে পৌঁছলেন।

ওদিকে মকুলের উপযুক্ত ছেলে রানা কুম্ভ, তাঁর সঙ্গে মাড়োয়ারের যোধরাও এসে মিলেছেন; গ্রামে-গ্রামে পরগণায়-পরগণায় তাঁদের লোক চাচা মৈর— দুই ভাইকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ীগ্রাম চিতোর থেকে বহুদূর। ক'ঘর ছুতোর-কামার, জনকতক, জোতদার কিষান, বেশির ভাগই গরীব গুর্বো। চাচা আর মৈর দুজন সর্দার তাদের মধ্যে এসে ভাঙা কেল্লাটা দখল করে ধুমধাম লাগিয়ে দেওয়াতে প্রথমটা তারা খুব খুশি হল! প্রথম-প্রথম দু-একবার তাদের সবারই পাল-পার্বণে কেল্লাতে নিমন্ত্রণ, আনাগোনাও হল; কিন্তু যতই টাকার টানাটানি হতে লাগল, ততই দুই সর্দার হাত গোটাতে লাগলেন। শেষে এমন দিন এল যে দুই সর্দারের কথা কেউ আর বড়ো একটা মুখেই আনত না। আবার পাহাড়ের উপর ভাঙা কেল্লার দুই বুড়োর নামে নানা-রকম গুজব রটতে লাগল! কেউ বললে, তাদের অনেক টাকা; কেল্লার মধ্যে তারা সেই সব ধন দৌলত এনে পুঁতে রেখেছে; রোজ তিনটে রাতে পাহাড়ের একটা দিকে কে যেন লণ্ঠন নিয়ে উঠছে সে স্বচক্ষে দেখেছে। কেউ বললে, দুই সর্দার কেল্লার মধ্যেকার একটা সুরঙ্গ দিয়ে দিল্লী যাওয়া-আসা করেন, নবাবও মাঝে মাঝে কেল্লায় এসে নাচ-তামাশা খাওয়া-দাওয়া করেন, তার ভাই একদিন হাট সেরে ফেরবার সময় সারঙ্গীর আওয়াজ আর মেয়েমানুষের গান স্পষ্ট শুনেছিল। একজন কামার কবে কেল্লায় দু-একটা মর্চে-ধরা দরজার খিল মেরামত করে এসেছিল, সে বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে দুই বুড়োতে একটা আগুনের উপরে লোহার কড়া চাপিয়ে মুঠো-মুঠো লোহা চুর ফেলছে, আর সেগুলো সোনা হয়ে উথলে পড়ছে। কড়াখানা কিন্তু মানুষের টাটকা রক্তে ভরা; দুটো কালো বাঘ সেই কড়াখানার চারিদিকে কেবল মাটি শুঁকে-শুঁকে ঘুরছে।

রাতকোটের কেল্লা ক্রমে নানা আজগুবি ভয়ংকর কাণ্ডের, ভয়ের আর তরাসের জায়গা বলে রটে গেল। ভয়ে সেদিক দিয়ে লোক আনাগোনাই আর করত না, দিনে-দুপুরে যেন তারা বাঘের গর্জন শুনতে থাকল, আর সন্ধ্যার সময় দেখতে লাগল— যেন কারা ঘোড়ার পিঠে থলে বোঝাই টাকা নিয়ে চলেছে— ঝম-ঝম।

দুই সর্দার মাসে-দুমাসে একবার হাটে নেমে আসতেন, কাপড়-চোপড় আটা গম একটা খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে আবার পাহাড়ের উপর কেল্লায় উঠে যেতেন। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে সারাগ্রাম হপ্তাখানেক ধরে সরগরম থাকত। সে নানা কথা— আটাওয়ালা দুই বুড়োকে আটা বেচে টাকার বদলে মোহর পেয়েছে। ঘি দশ সের তার দাম কতই বা? বুড়োদের ঘি বেচার পরদিনই গোয়ালার স্ত্রী গলায় হঠাৎ রুপোর হাঁসুলিটা দেখা যায় কেন? আর সেই কাপড়ের মহাজন, তার দোকান থেকে দুটো বুড়ো কেন যে এত শাড়ি কেনে, সেটা প্রকাশ হয়েও হচ্ছে না, সে কেবল মহাজনটা রীতিমতো কিছু মেরেছে বলে!

এদিকে গ্রামের ঘরে-ঘরে এই চর্চা, ওদিকে পাহাড়ের উপরে দুই বুড়োতে সেই কুড়োনো মেয়েকে তাদের সব ভালোবাসা দিয়ে আদর-যত্নে মানুষ করেছে। মেয়েটি তাদের প্রাণ, সেই ভাঙা কেল্লা, সেই মেয়ের হাসিতে, তার কচি গলার মিষ্টি কথায়, পাপিয়ার মতো তার গানের সুরে, দিন রাত ভরে রয়েছে। তার হাতে লাগানো ফুলের লতা ভাঙা দেওয়াল বেয়ে উঠে সকাল-সন্ধ্যায় ফুল ফেটাচ্ছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে রাজার ভয়ে দেশছাড়া এই দুটো বুড়োর জন্যে। একলা কেল্লায় এই তিনটি প্রাণী, আর আছে— এক পাহাড়ী কুকুর, দেখতে যেন বাঘ। সেই কুকুরই চাকর, দারোয়ান, সান্ত্রী, পাহারা— অজানা লোক যে হঠাৎ কেল্লায়

ঢুকবে, তার যো নেই। শঙ্খচিল যেমন পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বেঁধে বাচ্চা নিয়ে থাকে তেমনি শাদা-চুল দুই বুড়োতে সেই অগম্য পুরীতে আদরের মেয়েকে নিয়ে রয়েছেন— অনেকদিন ধরে। এমন সময় একদিন পায়ীগ্রামের দফাদারের সুন্দরী মেয়েটি হারাল। নদীতে ডুবে সে মরল, কি বাঘেই তাকে ধরলে কিছুই ঠিক হল না। কিন্তু সবাই ঠিক করলে যে ঐ বুড়ো সর্দার দুটো সুন্দরী দেখে মেয়েটিকে চুরি করেছে। মেয়ের বাপ পাগলের মতো হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত রাতকোটের কেল্লার পাশে পাশে ঘুরতে লাগল। তার নিশ্চয় বিশ্বাস সুন্দরিয়া তার ঐ কেল্লাতেই আছে। কেননা একদিন সকালে সত্যিই সে একটা মেয়েকে এলোচুলে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে বেড়াতে দেখেছে— খুব দূর থেকে যদিও কিন্তু সে যে তারই মেয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দফাদারকে সবাই পরামর্শ দিলে, 'যাও রানা কুম্ভের কাছে নালিশ করো গিয়ে। তোমার মেয়েটি যে ভয়ানক লোকদের হাতে পড়েছে, কুম্ভ ছাড়া কারো সাধ্যি নেই তাকে ছাড়িয়ে আনে।' বুড়ো দফাদার চলল। মরচে-ধরা তলোয়ার কোমরে বেঁধে, আর নিজের চেয়ে একটু বুড়ো এক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে একলা চিতোরের দিকে চলল সে।

রাতকোট থেকে চিতোর কত দিন-রাতের পথ তা কে জানে, দফাদার কিন্তু চলেছে। মেয়ের শোকে পাগলের মতো চলেছে; আর ফিরে-ফিরে রাতকোটের কেল্লাটার দিকে তলোয়ার উচিয়ে গালাগালি পাড়ছে; এমন সময় পথের মধ্যে তিন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় দফাদারের মুখে মেয়ে চুরির খবর শুনে তিনজনেই বললে, 'চলো, দফাদার-সাহেব, এর জন্যে আর রানার কাছে যেতে হবে না। আমরাই তোমার মেয়েকে উদ্ধার করে সেই বুড়োর দফা-রফা করে আসছি, চলো!' শুনে দফাদার ঘাড় নেড়ে বললে 'জানো

না সেই দুই বুড়োকে, তাই এমন কথা বলছ। মানুষের অগম্য স্থানে থাকে তারা। যদি কেউ সে-কেল্লা মারতে পারে তো রানা কুম্ভ! পাহাড় বেয়ে সেখানে উঠতে হবে রাস্তা নেই। বনে জঙ্গলে দিনে বাঘ হাঁকার দিয়ে ফেরে। কেউ সেখানে যেতে পারে না; আর গেলেও ফিরতে পারে না এমনি ভয়ানক পাহাড়ের চূড়োয় রাতকোটের কেল্লা! আর তারি মধ্যে রাক্ষসের চেয়ে ভয়ানক দুই বুড়ো বসে!' বলেই দফাদার হাউমাউ করে মেয়ের জন্যে কাঁদতে লাগল। তিন সেপাইয়ের মধ্যে সব ছোটো যে সেপাই, সে বললে, 'ভয় নেই, আমরা ঠিক সেখানে যাব, চলে এস।' ছোটো সেপাইয়ের কথা শুনে দফাদার একটু চটে বললে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না? আমি বলছি, সেখানে যাবার রাস্তা নেই!'

ছোটো সেপাই আর কেউ নয়, রানা কুম্ভ নিজে। চাচা আর মৈরকে সন্ধান করে শাস্তি দিতে চলেছেন। দফাদারের কথায় রানা হেসে বললেন, 'কেউ যদি কেল্লায় উঠতেই পারে না, তবে বুড়ো-দুটো তোমার মেয়েকে নিয়ে সেখানে গেল কোথা দিয়ে? রাস্তা নিশ্চয়ই আছে।' দফাদার আরও রেগে বলছে, 'ওহে ছোকরা, রাস্তা থাকলে আমি কি সেখানে না উঠে এদিকে আসি? নিজেই গিয়ে বদমাস দুটোর মাথা কেটে আমার মেয়েকে' বলেই বুড়ো আবার কাঁদতে লাগল। তিন সেপাই তাকে ঠাণ্ডা করে পায়ীগ্রামে ফিরিয়ে আনলেন।

গাঁয়ের মধ্যে সামান্য সেপাই-বেশে দফাদারের সঙ্গে রানা কুম্ভ যখন উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে— আকাশে কালো মেঘ জমে ঝড়বৃষ্টির উপক্রম হচ্ছে। গাঁয়ে এসে রানা খবর পেলেন, কেল্লার উপরে যে বুড়ো দুটি আছেন তাঁরা হচ্ছেন তাঁর বাপের খুড়ো— চাচা আর মৈর। রাগে কুম্ভ লাল হয়ে উঠলেন, 'চলো, আর দেরি নয় এখনি সেই দুটো পাপাত্মার উচিত শাস্তি দেব!'

রানা কেল্লার মুখে ঘোড়া ছোটালেন দেখে সঙ্গে দুটো সেপাইও চলল— পিছনে। দফাদর অন্ধকারে খানিক ওদের দিকে হাঁ-করে চেয়ে থেকে, ‘পাগল! পাগল!’ বলে ঘাড় নাড়তে-নাড়তে নিজের বাসায় খিল দিলে। সোঁ-সোঁ ঝড় বইতে লাগল আর তার সঙ্গে বৃষ্টি নামল। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উপর রাতকোটের কেল্লা— কালো অন্ধকারের একটা ঢেউ যেন আকাশজুড়ে স্থির হয়ে রয়েছে। ভিজে মাটিতে তিনটি ঘোড়ার পায়ের ছপ-ছপ শব্দ হতে থাকল। রানা বললেন, ‘ঘোড়া এইখানে ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলো।’ বনের মাঝে ঘোড়া বেঁধে তিন সেপাই পাহাড়ে চড়তে শুরু করলেন।

এদিকে পাড়াড়ের উপরে ভাঙা কেল্লায় দুটি বুড়ো আর তাঁদের সেই কুড়োনো মেয়েটি একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত-একখানা অন্ধকারের মধ্যে বসে গল্প করছেন আর কেল্লার ফটকে সিংহের মতো কটা চুল প্রকাণ্ড শিকারী কুকুর হিঙ্গুলিয়া ভাঙা দরজার চৌকাঠে মস্ত থাবা দুটো পেতে মুখটি বাড়িয়ে দুই কান খাড়া করে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে কেউ আসে কি না ভিজে বাতাসে শিকারী কুকুরের কাছে রাতে-ফোটা একটা বনফুলের গন্ধ ভেসে এল; তার পরেই কাদের পায়ের তলায় বনে কুটো-কাটা ভাঙার একটুখানি শব্দ হল। কুকুর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আস্তে-আস্তে বার হল— জঙ্গলের পথে। বনের মধ্যে ভিজে পাহাড়ের তাত উঠছে। অন্ধকারে দু-চারটে জোনাকিপোকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে! কুকুর পাহাড়ের পাকদণ্ডির ধারে চুপটি করে গিয়ে দাঁড়াল। রাতের বেলায় অচেনা কাদের পায়ের শব্দ শুনে শিকারী কুকুরের চোখ দুটো জ্বলছে। কুকুর সজাগ হয়ে বসে আছে। কিন্তু যারা পাহাড়ে উঠছে, তারাও কম সজাগ নেই— পাকা শিকারী পাকা যোদ্ধা রানা কুম্ভ, তাঁর চারণ, আর

মাড়োয়ারের যোধরাও! জানোয়ারের চোখ জ্বলছে কোন ঝোপের আড়ালে, সেটা এরা জোনাকির আলো বলে ভুল করলে না। রানার হাতের ছুরি সাঁ-করে গিয়ে বিঁধল হিঙ্গুলিয়ার বিশ্বাসী প্রাণটি ধুক-ধুক করছে ঠিক যেখানে। শিকারীর ছুরিতে কেল্লার একটি মাত্র রক্ষক, দুটি বুড়ো একটি কচি মেয়ের একমাত্র বন্ধু আর বিপদের সহায়— সেই সিংহের মতো হিঙ্গুলিয়া মরল— একটিবার কাতর স্বরে ডাক দিয়ে। সে যেন বলে গেল— 'সাবধান।' ঝড়ের বাতাসে সেই শেষ-ডাক ছেড়ে দিয়ে কুকুর স্তব্ধ হল! রানার বড়ো স্ফূর্তি হয়েছিল যে তিনি কেল্লা নেবার মুখেই একটা মস্ত সিংহ শিকার করলেন। সঙ্গীরাও বললেন, 'রানা, এ বড়ো সুলক্ষণ।' কিন্তু সেই ডাক যখন অন্ধকার চিরে পাহাড়ের চূড়োয় কেল্লার দিকে একটা কান্নার মতো ছুটে গেল, তখন সবার মুখ চুন হয়ে গেল। দেখলেন একটা কুকুর পড়ে আছে। তিনজন আস্তে আস্তে আবার চললেন। মনে কারু আর তেমন উৎসাহ রইল না।

ওদিকে সেই আঁধার ঘরের একটি পিদিম বাতাসে নিবু-নিবু করছে; তাকেই ঘিরে তিনটি প্রাণী। বুড়ো চাচা গল্প বলছেন, তাঁর ছোটো ভাই আর এক বুড়ো ছেঁড়া কাঁথায় বসে ঝিমচ্ছেন, আর একটি মেয়ে অবাক হয়ে শুনছে ঃ 'আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোটো। আমি চলতে শিখেছি আর ও তখন মায়ের কোলে-কোলেই ফেরে। মা আমার হাত ধরে চললেন— এতটুকু ওকে বুকে করে। গাঁয়ের সবাই বলতে লাগল, তুই কাঠুরের মেয়ে, কবে রানা ক্ষেতসিং তোকে বিয়ে করেছেন, তা কি তাঁর মনে আছে? মিছে চিতোর যাওয়া! মা ঘাড় নাড়ালেন, তারপর আমরা ঘর ছেড়ে বার হলেম। আমাদের সেই ছোটো ঘরখানি সেই সবুজ মাঠের ধারে সেই মস্ত তেঁতুলতলার দিকে চেয়ে আমার মনটা কেমন-কেমন

করতে থাকল। আমি কেবলি ঘরের দিকে ফিরে চলতে চাইলেম। মা কিন্তু আর সেদিকেও চাইলেন না— সোজা চললেন আকাশ যেখানে মাটিতে এসে মিলেছে বরাবর সেই দিকেই চেয়ে। সন্ধ্যা হলে পথের ধারে, কোনো দিন গাছ তলায় কোনো দিন খোলা মাঠে মা আমাদের নিয়ে রাত কাটান। সকালে আবার চলতে আরম্ভ করেন। দুপুরে কোনো দিন কোনো গাঁয়ে আসি, সেখানে যা ভিক্ষে পাই, তাই খাই! কোনো দিন কিছু পাইও না, খাইও না। এইভাবে মা আমাদের চলেছেন— চিতোরের রানার দুঃখিনী কাঠকুড়োনি রানী! কতকাল পথে-পথে কাটল তার ঠিক নেই! সারা বর্ষা চলে গেল— ভিজতে-ভিজতে পথ চলতে চলতে! শীত এল। মাঠের দুরন্ত বাতাস রাতের বেলায় গায়ে যেন বরফ ঢেলে দিতে লাগল। ছেঁড়া কাঁথায় আমাদের জড়িয়ে নিয়ে মা সারারাত কাঁদতেন আর জাগতেন। আমাদের দুঃখিনী মা— রানী মা! আমি এক একদিন বলতেম মা, ঘরে চলো। মা বলতেন, আর একটু গেলেই ঘর পাব। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতেম, দূরে কেবল একটা ঝাপসা পাহাড়ের ঠাণ্ডা নীল ঢেউ! মা, সেই নীলের দিকে চেয়ে চলতেন, আর এক-একবার তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ত। এমনি সে কত দিন, কত দূর চলে একদিন আকাশে আজকেরই পথের ধারে চুপটি করে ঘুমিয়ে ছিলেন, আমি তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বললেম, মা চেয়ে দেখো পাহাড়ের উপর কত বড়ো বাড়ি! মা একবার চোখ মেলে দেখে বললেন, ওই আমার ঘর! খানিক পরে আস্তে-আস্তে আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে একটি সোনার হার আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'রানাকে এইটে দেখাস, তিনি তোদের ঘরে ডেকে নেবেন।'

বুড়ো চাচার চোখে জল ভরে উঠল। মেয়েটি বললে, 'তারপর? কী হল?' কারো মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে চাচা উত্তর দিলেন, 'তারপর আর কী? রাজার রাজা যিনি, তিনি আমার দুঃখিনী মাকে ডেকে নিলেন— নিজের ঘরে!'

'আর তোমাদের?' মেয়েটি শুধাল।

চাচা আস্তে বললেন, 'আমরা গেলাম রানার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে কতকাল কাটালেম সুখে-দুঃখে দুই ভাই একলা! অত বড়ো রাজবাড়ি, সেখানে মাকে কোথায় খুঁজে পাব? দুজনে একলা থাকি আর মায়ের জন্যে কাঁদি— '

মেয়েটি ভারি ব্যস্ত হয়ে শুধোলে, 'রানার ঘরে মাকে পেলে না?'

চাচা ঘাড় নাড়লেন, 'না। কোথায় যে গেলেন মা, তা কেমন করে জানব? সে অনেক দিন পরে, দুই ভাই যখন বুড়ো হয়েছি, তখন এক দিন সকালে উঠে রাজসভায় যাব, এমন সময় দেখলেন, পথের ধারে মা আমাদের এতটুকু একটি কচি মেয়ে হয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে ঘরে যাব বলে কাঁদছেন। আমরা সেই অনেক দিনের হারানো মাকে ফিরে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘোড়া হাঁকিয়ে এই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হলেম।' মেয়েটি শুধোলে, 'রানা আবার কাঠকুড়েনি রানীকে কেড়ে নিতে এলেন না?' চাচা, মৈর দুজনেই বলে উঠলেন, 'খুঁজে পেলে তো রানা? আমরা এমন জায়গায় মাকে লুকিয়ে রেখেছি রানার সাধ্যি কী, সেখান থেকে মাকে খুঁজে বার করেন!' গল্প শুনতে-শুনতে মেয়েটির চোখ ঘুমিয়ে পড়ছিল। সে চাচার কোলে মাথা রেখে বললে, 'আমাকে একদিন তোমাদের মাকে দেখাবে?' চাচা আস্তে মেয়েটির চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, আর একটু বড়ো হও, তারপরে সেই নিরালা ঘরে একটি পিদিম জ্বালিয়ে মা যেখানটিতে একলা বসে আছেন সেখানে আমরা সবাই মিলে চুপি-চুপি চলে যাব।' মেয়েটি ঘুমের ঘোরে

দরজার দিকে চেয়ে বললে, 'হিঙ্গুলিয়া?' চাচার ভাই আফিমের ঝোঁক মাথা দলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে।' যারা গল্প বলছিল আর শুনছিল, সবাই আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল কেবল একটি পিদিমের আলো— অন্ধকারের মাঝে যেন কষ্টিপাথর-ঘষা একটুখানি সোনালী রঙ।

কোন সময়ে ঝড় বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ জানে না; কখন রানা কুম্ভ তলোয়ার খুলে ঘরে ঢুকেছেন, হঠাৎ একটা মেঘ গর্জনের সঙ্গে কড় কড় করে বাজ পড়ল। তিনজনেই চমকে উঠে দেখলেন তিনখানা খোলা তলোয়ার মাথার উপরে ঝকঝক করছে। রানা কুম্ভ ডাকলেন, 'ওঠো!' দুই বুড়োতে উঠে দাঁড়ালেন— মেয়েটির হাত ধরে। কুম্ভ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রানাকে খুন করেছ, রাজপুত্রের মেয়েকে চুরি করে পালিয়ে এসেছ, এর শাস্তি আজ তোমাদের নিতে হবে!'

চাচা অবাক হয়ে বললেন, 'রানাকে?'

মৈর আস্তে আস্তে বললেন, 'মকুলজীকে?'

কুম্ভ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁরই খুনের শাস্তি এই নাও!' দুখানা তলোয়ার একই সঙ্গে দুই বুড়োর মাথায় পড়ল। মেয়েটি 'মা!' বলে একবার ডেকে অজ্ঞান হল। ঝড়ের বাতাস কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঘরের পিদিম নিবিয়ে দিলে! কুম্ভ জানলেন, তাঁর বাপের খুনের শাস্তি দিলেন, রাজস্থানের সবাই জানলে তাই, কেবল ক্ষেতসিংহের কাটকুড়োনি রানীর দুই ছেলে, যাঁদের মাথা কাটা গেল, তাঁরাই জানালেন না, কেন রানা তাঁদের শাস্তি দিলেন! আর সেই মেয়েটি জানলে না দফাদারের ঘরে রাতারাতি কারাই বা তাকে রেখে গেল, আর কেনই বা সকলে গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে বলাবলি করলে— এ-তো নয়, সে-তো নয়! এমনি

নানা কথা কয়ে সবাই মিলে সন্ধ্যেবেলায় গাঁয়ের বাইরে, মাঠের ধারে কেন যে তাকে একা বসিয়ে দিয়ে সবাই যে যার ঘরে চলে গেল, আর কেনই বা সারা রাত চাচা, হিঙ্গুলিয়া, হিঙ্গুলিয়া বলে কেঁদে ডাকলেও কেউ সাড়াশব্দ দিলে না, আর সেই রাতকোটের কেল্লা অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল খুঁজে খুঁজে চলে-চলে পা ধরে গেল, তবু তো আর সেখানে সে ফিরতে পারলে না!— কেন? কেন?

তারপরে রানা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর রানী মীরা দেখতে যেমন, গান গাইতেও তেমন। রতিয়া-রানার মেয়ে মীরা! তাঁর গান শুনে রূপ দেখে রানা কুম্ভ তাঁকে বিয়ে করেন। রানী স্বামীর সেবা করেন কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে— রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরে বাঁশি হাতে কালো পাথরের দেবমূর্তির পায়ের কাছে।

রানার কিন্তু এ ভালো লাগে না। তিনি নিজে কবি, গান রচনা করেন, আর সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে— এই চান রানা। কিন্তু সে তো হল না! মীরা দেবতার দাসী, তিনি রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরেই সারা দিনমান ভক্তদের মধ্যে গাইতে লাগলেন, ‘মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!’

চিতোরেশ্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভারী লজ্জার কথা হয়ে উঠল। রানা হুকুম দিলেন, ‘মন্দিরে বাইরের লোক আসা বন্ধ করো।’

এক রাতের মধ্যে মন্দিরটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল। মীরাকে আর কেউ দেখতে পায় না কিন্তু গানের সুর শুনতে কানাতের বাইরে দেশ-বিদেশের লোক জড়ো হয়। বাঁশি শুনে হরিণ যেমন, তেমনি সবাই এক-মনে কান-পেতে প্রাণ

ভরে মীরার গান শুনতে থাকে— তাড়ালে যায় না, হুকুম শোনে না, কাউকে মানেও না।

জোছনা-রাতে মন্দিরের সামনে শ্বেত-পাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হীরে-জড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপ্সরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, গাইছেন, রানা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভিড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো একগাছি হীরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রানা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন। মীরা সেই অমূল্য হার নিজের গলা থেকে খুলে মন্দিরের মধ্যে বংশীধারী রণ্‌ছোড়জীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সে-রাতের মতো গান বন্ধ করলেন। হার যে কে দিয়ে গেল, তার আর খোঁজ হল না, কিন্তু দেশে নানা কথা রটল। কেউ বললে, দিল্লীর বাদশা দিয়ে গেছেন; কেউ বললে কে-এক উদাসীন, কেউ বা আরো কত কী! কিন্তু মীরা অমূল্য হার রানাকে না দিয়ে যে রণ্‌ছোড়জীকে নিবেদন করে দিয়েছেন তাতে সবাই খুশি হল। ভক্তেরা মীরার জয়জয়কার দিলে! কিন্তু কুম্ভ রানা একটু চটলেন। তিনি হুকুম দিলেন, 'এবারে ভক্তেরা আসুন আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্দরে।' এই হুকুম দিয়ে রানা মহম্মদ খিলজীর সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন। মীরার গান বন্ধ হল। সেই সঙ্গে চিতোর নিরানন্দ হয়ে গেল। মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা; অন্দরে কাঁদেন মীরা। নন্দলালার দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের মতো মীরা দিন-দিন মলিন হচ্ছেন, এমন সময় একদিন যুদ্ধ জয় করে ধুম-ধামে মহারানা চিতোরে এলেন। মামুন-শাকে তার মুকুটের সঙ্গে রানা চিতোরে বন্ধ রাখলেন। রাজ্যের কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ তুলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু মীরার মন রানা জয় করতে পারলেন না; মীরা বললেন, 'রানা,

আমি নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ কোরো না। আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন— ‘মীরা আয়!’ আমাকে ছেড়ে দাও রানা, আমি পথের কাঙালিনী হয়ে নন্দলালার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে যাই!’ রানা রেগে বললেন, রতিয়া সামান্য সর্দার, তার মেয়ে তুমি! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন? যাও বেরিয়ে— যেখানে খুশি— আমি নতুন রানী নিয়ে আসছি।’ সেইদিন চিতোরেশ্বরীর মীরা নন্দলালার মীরা, ভিখারিনীর মতো একতারা বাজিয়ে পথে বার হলেন। আর রানা বার হলেন নতুন রানীর খোঁজে।

মন্দুর-রাজকুমারের সঙ্গে ঝালোয়ারের রাঠোর সর্দারের মেয়ের বিয়ে, বর আসছে ধুমধাম করে, এমন সময় রানা কুম্ভ এসে ঝলকুমারীকে সভার মধ্যিখান থেকে কেড়ে নিয়ে চিতোরে আনলেন। একে মহারানা, তাতে কুম্ভ, তাঁর উপর কথা কয় রাজস্থানে এমন তো কেউ নেই! কেবল বৃন্দাবনে মীরা যখন শুনলেন, মন্দুর-রাজকুমারের মুখে, রানা দুই প্রাণীর ভালোবাসার উপরে কী বিষম ঘা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঝলকুমারীর বরকে নিয়ে চিতোরে চললেন। রানার কাছে খবর পৌঁছল মীরা আসছেন। আর কেন আসছেন সেটাও শুনলেন কুম্ভ। রানা কড়া হুকুম দিলেন, ‘ঝলোয়ান-বাগানের মধ্যে ঝলকুমারীকে কড়া পাহাড়ায় যেন বন্ধ রাখা হয়!’ তারপর কুম্ভ মীরাকে এক চিঠি পাঠালেন— চিতোরেশ্বরী মীরা, চিতোরেশ্বর তাঁকে পেলে সুখী হবেন। তিনি যা ভিক্ষা চাইতে এসেছেন, সেই স্ত্রী-রত্ন যেখানে বন্ধ আছে, সেই ঝলোয়ানের চাবিও রানা পাঠালেন। ইচ্ছে করলে বাগানের দরজা খুলে রানী মীরা ঝলকুমারীকে দেখে আসতে পারেন। কিন্তু মন্দুরের রাজকুমার যদিও বা কোনো উপায়ে ঝলোয়ানের বাগানে প্রবেশ করেন, কুমারীর দেখা পাবেন না নিশ্চয়।

কেননা, রানার অন্দরে রানী ছাড়া কোনো পুরুষের যাবার হুকুম নেই। যদি যায়, তবে মাথা বাইরে রেখে যায় এটা জানা কথা!

তখন সন্ধ্যা আসছে। আকাশে একটিমাত্র তারা; আর দূরে ঝলোয়ানের বাগানের মধ্যে, পাথরের রাজপ্রাসাদের উপরে একটি ঘরে একটি আলো জ্বলজ্বল করে জানাচ্ছে মন্দুরের রাজকুমারের উপরে ঝলকুমারীর জ্বলন্ত ভালোবাসা! ঠিক সেই সময়ে রানার চিঠি মীরা পেলেন! চিঠি পড়ে মীরা বুঝলেন উপায় নেই। তিনি দুটি কথা রানাকে লিখলেন— 'প্রেম না করলরে, বিনা প্রেমসে প্রেম না মিললরে!' মীরা মন্দুরের রাজকুমারের হাতে ঝলোয়ানের চাবি দিয়ে চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন; আর মন্দুর-রাজকুমার ঝলকুমারীকে শেষ-দেখা দেখে নিতে বাগানে ঢুকলেন— আলোর নিশানার দিকে চেয়ে।

সেই রাতকোটের কেল্লায় অন্ধকার-রাতে দুটি বুড়ো আর একটি কচি মেয়ের ভালোবাসার প্রদীপ যেমন করে হঠাৎ নিবেছিল, আজও আবার তেমনি করে রানা কুম্ভ নিজের অন্দরে ঝলকুমারীর ভালোবাসার প্রদীপটি তলোয়ারের চোটে নিবিয়ে দিয়ে সকালে রাজসভায় এসে বসলেন। কারিগর এসে জোড়-হাতে বলল, 'মহারানার কীর্তিস্তম্ভ শেষ হয়েছে। স্তম্ভের নাম কী, জানতে চাই। পাথরের খোদাই করতে হবে।'

কুম্ভরানা খানিক ভেবে বললেন 'লেখগে যাও— কুম্ভশ্যাম।'

সংগ্রামসিংহ

রানা কুম্ভ অনেক লড়াই করেছিলেন, অনেক দেশও জয় করে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ঝুনঝুনের লড়াই যেমন, তেমন আর কোনো লড়াই হল না। আর লড়াই ফতে হবার পর নাচ-তামাশা, গান-বাজনা, আতসবাজি, আলো যেমন হতে হয়। একমাস ধরে চিতোর শহর রাতে দিন হয়ে গেল। কিন্তু একটি কাণ্ড ঘটল। লড়াই জিতে আসবার পরদিন থেকে কুম্ভ হাতের তলোয়ার তিনবার মাথার উপর ঘুরিয়ে ফারসি না আরবিতে কী জানি কী সাপের মন্তর না ব্যাঙের মন্তর আউড়ে তবে নিজের সিংহাসনে বসতে লাগলেন। শুধু এক আধ দিন নয়, এই কাণ্ড বরাবর চলল। রানা বুড়িয়ে গেলেন তবু তলোয়ার ঘোরানো আর মন্তর পড়া একটি দিন কামাই গেল না। রানার কাণ্ড দেখে সভাসুদ্ধ অবাক হয়ে যেত, কিন্তু কেন যে রানা এমন করেন সে কথা জানতে কেউ চেষ্টাও করত না। একবার রানার বড়ো ছেলে সভার মাঝে রানাকে শুধিয়েছিলেন— মাথার উপরে তিনবার তলোয়ারখানা ঘোরাবার কারণটা কী? আর ওই সাপের মন্তরগুলোরই বা মানে কী? সেইদিন রানা কুম্ভ জবাব দিলেন, 'বারো ঘণ্টার মধ্যে চিতোর ছেড়ে চলে যাও, বাপ কী করেন, সে খোঁজ ছেলের রাখবার কিংবা জানবার দরকার নেই।' তারপর তিনবার করে ঠিক নিয়মিত রানার তলোয়ার মাথার উপরে ফিরতে লাগল কিন্তু হুকুম আর ফিরল না। রানার বড়ো ছেলে রায়মল নির্বাসনে গেলেন, রইলেন কেবল ছোটো ছেলে সুরজমল আর মেজ ছেলে— তার নাম রাজস্থানে কেউ এখনো করে না— 'ঘাতীরাও' হাতিয়ারো' এমনি নানা নামে সে লোকটাকে ডাকে। এই 'ঘাতীরাও' বিষ খাইয়ে বুড়ো রানা কুম্ভকে মেরে

চিতোরের সিংহাসনে বসল। রাজপুত প্রজারা এই বিষম ঘটনায় একেবারে খাপ্পা হয়ে খুনের শোধ খুনই ঠিক বলে স্থির করে রায়মলকে আবার সিংহাসনে দেবার ফন্দি করলে। দিল্লীতে তখন প্রথম পাঠান সুলতান বহলোল লোদী। তার সঙ্গে 'ঘাতীরাও' কুটুম্বিতা করে, নিজের মেয়ের সঙ্গে সুলতানের বিয়ে দেবার ফন্দি করে, খুব শক্ত হয়ে চিতোরের সিংহাসনে বসে থাকার মতলব করছে, এমন সময় ইদর রাজ্য থেকে রায়মলকে রাজপুত সর্দারেরা খুঁজে বার করলেন। 'ঘাতীরাও' বড়ো-বড়ো সর্দারদের বড়ো-বড়ো জমিদারির লোভ দিয়েও নিজের দলে টানতে পারলে না! যে নিজের বাপকে খুন করতে পারে, রাজপুতের মেয়েকে পাঠানের বেগম করে দিতে চায়, তার দলে কোন রাজপুত থাকতে পারে? 'ঘাতীরাও' কাজেই গতিক খারাপ দেখে একদিন রাতারাতি সুলতানের দরবারে গিয়ে মেয়ের বিয়ের সব পাকা করে চুপি-চুপি আবার চিতোরে এসে বসবার মতলবে ঘোড়া ছুটিয়ে একা আসছে, এমন সময় পথের মধ্যে বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হল।

এই অবসরে রায়মল চিতোর দখল করে বসলেন।

সুলতান বহলোক চিতোরের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসে দেখলেন বাহান্ন হাজার সওয়ার আগে, এগারো হাজার পাইক সঙ্গে, রায়-বাঘের মতো রায়মল তাঁকে ধরবার জন্যে পাহাড়ের উপর বসে আছেন। পাঠান সুলতান বিয়ে করতে এসেছিলেন বর সেজে, কিংখাবের লুঙ্গি কোমরে জড়িয়ে, জরির লপেটা ফেলে চম্পট দিলেন যেখান থেকে এসেছিলেন সেই দিল্লীতে!

রায়মল, তাঁর তিন ছেলে সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, জয়মল আর একটি মাত্র ছোটো ভাই সুরজমল এই চারজনকে নিয়ে চিতোরে বসে রাজত্ব করতে থাকেন, সেই

সময়ে একদিন তখন রানা হয়েছেন বুড়ো, ছেলেরা হয়েছে বড়ো, দেশে রয়েছে শান্তি, আর সুখে রয়েছে রাজাপ্রজা সবাই— তখন প্রচণ্ড গরমকালে দুপুরবেলায় বাইরে আগুন হাওয়া, বুড়ো রানাজী ভীম তালাওয়ের মাঝখানে জলের উপরে শ্বেতপাথরের তাওখানায় আরাম করছেন। রাজকুমার তিনজন ছোটো-খুড়ো সুরজমলের বাগান-বাড়িতে আড্ডা করছেন আর তাশ, দাবা, গোলাপজলে ভিজানো খসখসের পাখা এমনি সব নানা কুড়েমি ও আয়েসির সাজ-সরঞ্জামের মাঝে বসে এ-গল্প সে-গল্প চলছে, কিন্তু বাইরে বইছে গরম বাতাস এমন গরম যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ফেটে তো গেছেই, ঘরের মধ্যেকার দেওয়ালগুলো থেকেও তাপ উঠছে। কাজেই ঘরের মধ্যে রাজকুমারেরা ঠাণ্ডা হতে চাইলেও বেশিক্ষণ ঠাণ্ডা রইলেন না।

এ-কথায় সে-কথায় কজনের মধ্যে কে কেমন বীর, কোন লড়াই কে ফতে করে কোন-কোন পরগণা দখল করেছেন, প্রজারা কার নামে কী বলে, এমনি নানা খুটিনাটি খিটিমিটি থেকে রাজসিংহাসন উচিত মতো কে পেলে প্রজারাও সুখী হয়, দেশেরও ভালো হয়— এই তর্ক উঠল। রানার মেজছেলে পৃথ্বীরাজ যেমন সুপুরুষ তেমনি সাহসী; বড়োছেলে সঙ্গ দেখতে মোটেই রাজপুত্রের মতো নন— শাদাসিদে ছোটোখাটো মানুষটি ধীর-গম্ভীর বড়ো-বড়ো টানা চোখ; ছোটোছেলে জয়মল কাটখোট্টা, মোটা-সোটা যেন চোয়াড় গোছের, আর রানার ভাই সুরজমল খুব সুপুরুষ নন খুব কদাকারও নন— অনেকটা বুড়ো রানারই মতো নাক চোখ! তিন ভায়ে বিষম তর্ক বাধল সিংহাসন নিয়ে।

পৃথ্বীরাজ বললেন, ‘প্রজাদের হাতে যদি রাজা বেছে নেবার ভার পড়ে তো দেখে নিও আমাকেই রাজপুতেরা রাজা করবে!’ জয়মল বলে উঠলেন, ‘ওসব

বুঝিনে। দেখছ এই হাতখানা। জোর যার মুলুক তার!' সঙ্গ, তিনি সবার বড়ো একটুখানি হেসে বললেন, 'ভবানীমাতা যাকে সিংহাসন দেবার দিয়ে বসে আছেন, বিশ্বাস না হয়, চল চারণীদেবীর মন্দিরে গুনিয়ে দেখি কার অদৃষ্টে সিংহাসন লেখা রয়েছে।' সুরজমল তিনজনকে ধমকে বললেন, 'আঃ, এ সব কী কথা হচ্ছে? দাদা শুনলে রক্ষে থাকবে না। হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমাকেও দেশছাড়া করবেন। সিংহাসন নিয়ে নাড়াচাড়া কেন বাপু। একি সতরঞ্চ না দাবা খেলা পেলে, যে এখনি রাজা উজির মারছ? নাও, একটু গোলাপ-জল মাথায় দাও, ঠাণ্ডা হও; থাক ওসব কথা।' কিন্তু বাইরের গরম তখন রাজকুমারদের মগজে চড়েছে, ঠাণ্ডা হবে কে? সবাই উঠে বললেন, 'চলো খুড়ো, থাক এখন ঠাণ্ডা হওয়া; চারণীর কাছে গুনিয়ে আজ ঠিক করব সিংহাসনটি কার পাওনা।' বুদ্ধিমান সুরজমল দেখেন বিপদ— গেলে রাগেন দাদা, না গেলে রাগেন দাদার তিন পুত্তুর, তার মধ্যে একজন গুণ্ডা আর একজন বেজায় সাহসী; কাজেই সুরজমল চললেন বলতে-বলতে, 'শেষে দেখছি রাজত্বটা আমারই হবে, তোমরা তিন ভাই হয় দেশছাড়া হবে কালই দাদার হুকুমে, নয়তো দুদিন পরে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরবে; বাকি থাকব আমি রাজ্যের ভোগ ভুগতে।'

পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, 'সেই জন্যে তোমাকেও সঙ্গে নিচ্ছি; তোমারও কপালে কী আছে দেখা চাই তো?'

সুরজমল নিজের আর তিন ভায়ের কপালে এক-একবার টোকা মেরে বললেন, 'গুনে দেখার প্রয়োজন নেই, আওয়াজেই বুঝছি সব ফোঁপরা।'

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানে এক পাহাড় তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী যোগিনী।

পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যাপূজার যোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন; মন্দির খালি; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে, আর সামনে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যাবেলার আলো পড়েছে— রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে। সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সুরজমল বলে উঠলেন, ‘কেমন, বলেছিলাম তো কপাল ফোঁপরা। মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি করে প্রণাম দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলো।’ পৃথ্বীরাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘তা হবে না, এইখানে বসতে হবে, আরতির পর হাত গুনিয়ে তবে ছুটি!’ একদিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল আর একদিকে সিদ্ধি করার খাটিয়া, তার উপরে ছেঁড়া কাঁথা পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসল। বাঁশের খাটিয়া একবার মচাৎ করে শব্দ করেই চুপ করল। সঙ্গে গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপর মাটিতে, আর সুরজমল বসলেন একটা হাঁটু বাঘছালে রেখে একেবারে আগুনের মতো তপ্ত পাথরের মেঝেয়।

ভর সন্ধ্যায় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন চার মূর্তি। সঙ্গ উঠে, সিদ্ধিকরীকে নমস্কার করে বসলেন। সুরজমলকে আর উঠতে হল না— তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। পৃথ্বীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘাড়টা নোয়ালেন, হাত দুটো কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল; আর জয়জমলটা উঠলও না, নমস্কারও দিলে না, বসে-বসেই বললে, ‘মাতাজী গণনা করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের

সিংহাসনটা রয়েছে’ সিদ্ধিকরী কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালে হাত বোলাতে লাগলেন আর গেরুয়াকাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে থাকলেন দেখে পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন— ‘ভাবেন কী? বড়ো জরুরি কথা। বেশ করে ভেবে-চিন্তে গণনা করে উত্তর দেবেন।’ সঙ্গ বললেন, আগে চারণীর পুজোটা ওঁকে সেরে নিতে দাও, পরে ওসব কয়ো।’

‘সেই ভালো।’ বলে সিদ্ধিকরী পুজোয় বসলেন।

তারপর চারণীর সামনে একবার পিদিম নেড়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চারপুত্রের পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বললেন, ‘রাজকুমারেরা, একটা ইতিহাস বলি শোনো— পূর্বকালে উজ্জয়িনীনগরে একদিন মহারাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ করতে বসবেন এমন সময় লক্ষ্মী সরস্বতী বিবাদ করতে করতে সেখানে উপস্থিত। মহারাজা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বললেন, ‘দেবী আপনাদের কী প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন!’ দুজনেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, ‘বৎস বিক্রমাদিত্য, তুমি তো রাজা, বিচার করো দেখি আমাদের দুইজনের মধ্যে কে বড়ো!’ বীণা হস্তে সরস্বতী ঝংকার দিয়ে বললেন, ‘এই আমি, না ওই ওটা, কে বড়ো?’ রাজা দেখেন বড়ো গোলযোগ— ‘এঁকে বড়ো করলে উনি চটেন, ওঁকে খাটো করলে তিনি চটেন। রাজা দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন দেখে বিক্রমাদিত্যের ছোটো রানী বলে উঠলেন— ‘ঠাকুরুনরা রাজাকে কিছু খেয়ে নিতে দিন, সারাদিন বিচার করে ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই, সুবিচার করেন কেমন করে? আজকের রাতটা ওঁকে ভেবে ঠিক করতে দিন, কাল রাজসভায় ঠিক বিচার হয়ে যাবে দেখবেন।’ রাজা বললেন, ‘এ পরামর্শ মন্দ নয়, কঠিন সমস্যা, একটু সময় পেলে

ভালো হয়।' দেবীরা 'তথাস্তু' বলে বিদায় হলেন। রাজা জলযোগে বসে ছোটোরানীকে বললেন, 'দেবীদের আজকের মতো তো বিদায় করলে কিন্তু কালকের বিচারটা কী হবে কিছু ঠাউরেছ কি?' রানী ভিরকুটি করে বললেন, 'বিচারের আমি কী জানি! তোমার সভায় নবরত্নের মধ্যে কেউ পণ্ডিত, কেউ কবি, কেউ মন্ত্রী; তাঁদের শুধোও না।' রাজা মাথা চুলকে সভায় প্রস্থান করলেন। সভার মধ্যে নবরত্ন হাজির— ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি। রাজার প্রশ্ন শুনে ন'জনেই মাতা চুলকোতে আরম্ভ করলেন; রাত্রি দুই প্রহর বাজল কিছুই মীমাংসা হলো না, দুই দেবীর বিচার কী হিসাবে করা যায়? সরস্বতীকে বড়ো বললে চটের লক্ষ্মী, রাজ্যপাট সব যায়, নবরত্নের মাসহারাও বন্ধ হয়। আবার যদি বলা যায় সরস্বতী ছোটো, লক্ষ্মীই বড়ো, তবে বিদ্যে পালায়, বুদ্ধি পালায়, কালিদাসের কবিতা লেখা বন্ধ, ধন্বন্তরির চরকসংহিতা, বরাহমিহিরের পাঁজি পুঁথি খনার বচন সবই মাটি। রাজাই বা কী বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য চালান, হিসেব দেখেন, বিচার করেন? বিক্রমাদিত্য বিষম ভাবিত হয়ে অন্দরে এসে বিছানা নিলেন। রানী দেখেন রাজার নিদ্রা নেই, কেবল এপাশ-ওপাশ করছেন; যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে।

তারপর— '

এমন সময় পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন— 'ও-গল্প তো আমরা জানি। দুই দেবীর একজন এসে বসেছিলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে, অন্যে বসেছিলেন রুপোর খাটে; ছোটো-বড়ো বিচার আপনি হয়েছিল। গল্প থাক, এখন দেখুন দেখি বিচার করে আমাদের মধ্যে রাজ হবে কে?'

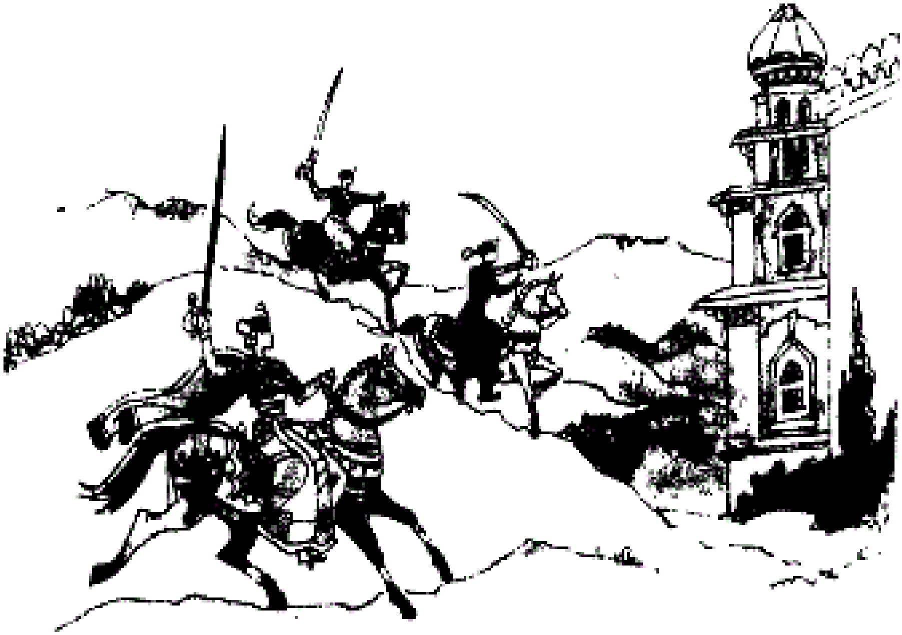

সিদ্ধিকরী একবার চারজনের দিকে চেয়ে বললেন, 'রাজকুমার, তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিচার শেষ করে বসে আছ! সঙ্গ— যিনি বসে আছেন বাঘছালে বীরাসনে, উনি ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন— রাজ্যেশ্বর! সুরজচমল রয়েছেন মাটিতে— সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকবেন— হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় জমিদার। আর পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা বসেছ সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়, কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই!' এই কথা বলেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলেন; চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মতো কটমট করে এর ওর দিকে চাইতে থাকল।

সর্ব-প্রথম সুরজমল কথা বললেন, ‘তাহলে?’

‘তাহলে সিংহাসন কার এখানেই স্থির হয়ে থাক আজই!’ বলেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাইরে যাবেন, তলোয়ারের চোট পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণীদেবীর সামনে ভায়ের হাতে ভায়ের রক্তপাত ঘটল। সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদিকে গেলেন সুরজমল; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর একদিকে— এঁর পেছনে উনি তাঁর পিছনে তিনি; অন্ধকার ঢেকে নিলে চারজনকেই।

চারণীমন্দির থেকে প্রায় এক রাতের পথ রাঠোরসর্দার ‘বিদা’র কেল্লার বুরুজের ধরনের কাঁচামাটির দেওয়ালঘেরা খামার বাড়ি। ভোর হয়ে আসছে কিন্তু মেঘে-ঢাকা আকাশে তখনো আলোর টান একটিও পড়েনি। উঠোনের মাঝে মস্ত তেঁতুল গাছটার আগায় পোসা ময়ূরটা ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে আছে। গাছের তলায় হালের গরু দুটো মাটিতে পড়ে আরামে ঝিমচ্ছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই; কেবল সর্দারের ঘোড়া নিয়ে দরজার কাছে একটা ছোকরা-রাজপুত দাঁড়িয়ে আছে; সেই ঘোড়া এক-একবার ঘাড় নাড়ছে আর তারই মুখের লাগামে পরানো লোহার আংটা আর কড়াগুলো এক-একবার আওয়াজ দিচ্ছে— টিংটিং ঝিনঝিন। বিদা দূরগ্রামে পুজো দিতে যাবেন, তাই ভোর না হতেই প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বার হবেন, এমন সময় দূরে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল— কে যেন তেজে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। দেখতে-দেখতে রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ ‘রক্ষা করো’ বলে বিদার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। তাঁর একটা চোখের উপরে তলোয়ারের চোট পড়েছে, শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। বিদা তাড়াতাড়ি দরজা

খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, ‘একি! এমন দশা আপনার কে করলে?’ সঙ্গ দুকথায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন প্রাণ সংশয়, পৃথ্বীরাজ আর সুরজমল দুজনেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন কিন্তু জয়মল এখনো পিছনে তাড়া করে আসছেন তাঁকে মারতে। বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, ‘রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে নতুন ঘোড়ায় অন্য গ্রামে রওনা হবেন।’ ওদিকে জয়মল আসছেন, একটা ঝড়ের মতো— মাঠের উপর দিয়ে। সঙ্গের ইচ্ছা তখনই তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু রাজভক্ত বিদা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না কিছু না খাইয়ে-দাইয়ে। ওদিকে বিপদ ক্রমে এগিয়ে আসছে। সঙ্গ ইতস্তত করছেন দেখে বিদা বললেন, ‘কোনো ভয় নেই, আপনি ভিতরে যান। নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করে যতক্ষণ না আপনি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ জয়মলকে এই দরজার চৌকাঠ পার হতে হবে না, আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখব।’ তাই হলো। সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে পুবমুখে অনেক দূরে ছোটো একটা কালো ফোঁটার মতো আস্তে-আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, সেই সময় তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সঙ্গ চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঝে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবুচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুত বীরের রক্তে রাঙা হাতখানি দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রইলেন— তারপর ঘাড় নিচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সকাল হয়ে গেল, কোন অজানা গাঁয়ের কিষানরা সকালে খেতে যেতে-যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথ্বীরাজ। সবাই মিলে ধরাধরি করে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এদিকে মহারানারও লোকজন— তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে ঘোড়া পাল্কি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে, কিন্তু কেবল পৃথ্বীরাজ সুরজমল দুজনকে তারা সন্ধান করে ফিরে পেলে, আর দুজন যে কোথায় তার খবরই হল না।

পৃথ্বীরাজ রানীদের যত্নে আস্তে-আস্তে সেরে উঠলেন, সুরজমলের চোট বেশি, অনেক তদ্‌বিরে তিনি সুস্থ হলেন।

মহারানা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে বললেন, ‘এই যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্যে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে, কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না; বেঁচে থাকে তো তোমারই ভয়ে সে কোথায় লুকিয়ে আছে। মনে কোরো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুজলেই আস্তে-আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও! লড়তেই চাও তো বড়ো-ভায়ের সঙ্গে না লড়ে পারো তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করোগে, তবে বুঝব তুমি বীর— যাও!’

ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রানা ডেকে বললেন, ‘তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই জন্যে তোমাকে শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাকো, চিতোরমুখো হয়ো না।’

সুরজমল তো নির্বাসনে যান।

এখন পৃথ্বীরাজ বার হলেন চিতোর ছেড়ে দিক্‌বিজয়ে। তিনি জানতেন মহারানার কাছে যদি কখনো ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন করে তবে। রানা রাগলেও, প্রজারা পৃথ্বীরাজকে সত্যিই ভালোবাসত, কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হল না। দু-একজন করে ক্রমে একটি ছোটোখাটো দল তার সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হল এখানে-ওখানে লড়াই করে বেড়ানো। এমনি এদেশে সেদেশে দল নিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে পৃথ্বীরাজের যা-কিছু টাকাকড়ি সম্বল ছিল গেল ফুলিয়ে। শেষে এমন দিন এল যে দিনের খোরাক, তাও জোটানো ভার!

এখন একটা ছোটো-খাটো রাজ্য জয় করে না বসতে পারলে আর উপায় নেই। এই অবস্থায় পৃথ্বীরাজ একদিন নিজের হাতের একটা মানিকের আংটি গদাওয়ারের উঝা নামে এক জহুরীর কাছে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আনতে পাঠালেন। এই উঝাই একদিন ঐ আংটিটা পৃথ্বীরাজকে অনেক টাকায় বেচেছিল; আংটি দেখেই জহুরী তাড়াতাড়ি টাকাকড়ি নিয়ে যেখানে পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একটা সরাইখানায় দিন কাটাচ্ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে বললে, ‘এ কী দেখছি রাজকুমার! টাকার দরকার ছিল তা একটু লিখে পাঠালে হত, আংটিটা বাঁধা দিয়ে বাজারে কেন বদনাম কিনছেন?’ পৃথ্বীরাজ উঝাকে চুপিচুপি বুঝিয়ে বললেন, ‘ওই আংটি ছাড়া আমার এমন কোনো সম্বল নেই যে তোমার টাকা দেব, তাছাড়া আংটি তো একদিন না একদিন পেটের দায়ে বেচতেই হবে। আমার কতগুলি সঙ্গী দেখছ তো! এদের শুকনো মুখে আধপেটা তো রাখতে পারিনে!’ পৃথ্বীরাজের দুঃখের কাহিনী শুনে উঝার চোখে জল এল। সে দুই হাত জোড়া করে বললে, ‘কুমার, এই নিন টাকা! আমি আংটি

চাইনে! আমি আপনার প্রজা, মহারানার নুন চিরকাল খাচ্ছি।' পৃথ্বীরাজ উঝাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'ভাই, আজ যেন তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, কিন্তু এরপরে কী হবে?' উঝা পৃথ্বীরাজকে চুপিচুপি বললে, 'দেখুন মীনা-সর্দারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই দেশটা আপনি দখল করে বসুন। রাজ্যের একটা শত্রুও নাশ হবে, আপনারও মান বাড়বে।'

পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সেই দিনই গিয়ে মীনা-সর্দারের কাজে দলবল নিয়ে ভর্তি হলেন। রাজস্থানের মীনারা জংলী, দুর্দান্ত জাত; লুটপাট করাই তাদের কাজ। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন করছে। মহারানাকেও সে তুচ্ছ করে; নদালা বলে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী— যশ, সিন্ধিয়া, সঙ্গমদৈবী, অভয় আর জঙ্কুকে নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করার মতলব করলেন। আহেরিয়া রাজস্থানের একটা মস্ত আনন্দের দিন। সেইদিন চাকর-মনিব সব এক হয়ে শিকার, বনভোজন— এমনি নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সেই আনন্দের দিনে মীনারায় বড়ো-বড়ো মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে, সেই সময় নিজের দলবলসমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ করে তাদের ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকি রইল, বন-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে। উঝাকে পৃথ্বীরাজ গদাওয়ারের শাসনকর্তা করে নিজের ধার শুধে আবার দিক্‌বিজয়ে বার হলেন— রীতিমতো ফৌজ আর রসদ সঙ্গে।

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে-ঘুরতে, বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময় বেদনোরে টোডার রাজা রায় শূরতান সিং পাঠানদের উৎপাতে রাজ্য-সম্পদ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমা সুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারানার আশ্রয়ে

বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী! কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে, তাকেই বিয়ে করবেন। জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন— ঘোড়ায় চড়ে ধনুর্বান হাতে শিকারে চলেছেন— যেন দেবী দুর্গা! জয়মল টোডা রাজ্য উদ্ধার করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন! শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির করে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না; উল্‌টে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী করে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন। শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপিচুপি শূরতানের অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হলেন— ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে। বেশিদূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা; তাঁকে ধরে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হলো না। তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়ন-ঘর থেকে একেবারে হাতে ধরে টেনে বাইরে আনার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না! এক ঝাপটায় জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটি ছুরির ঘায়ে, তার সব আস্পর্ধা শেষ করে দিলেন। শূরতান সিংহ ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ থেকে ভূঁয়ে নামিয়ে মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিলেন রীতিমতো। জয়মল মহারাজার ছেলে; আর শূরতান রাজা হলেও এখন মহারানার আশ্রিত; কাজেই চিতোরে যখন এই খবর পৌঁছল, তখন সবাই ভাবলে এইবার শূরতান গেলেন! কিন্তু মহারানা সমস্ত ব্যাপার শুনে

দূতদের বললেন, ‘জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়, সে মিথ্যাবাদী, চোর, নির্বোধ, গোঁয়ার। কোন বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমার কোনো আক্ষেপ নেই। যাও শূরতানকে বলো গিয়ে আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।’

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটোভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সেইদিনই বেদনোরের দিকে রওনা হলেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই— দুজনেই সমান সুন্দর। সমানে-সমানে মিলল! ইনি দেখলেন ওঁকে, উনি দেখলেন এঁকে। ভালোবাসলেন দুজনেই দুজনকে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ করতে পারলে বিয়ে হবার উপায় নেই! পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করলেন টোডারাজ্য তিনি উদ্ধার করবেনই; আর সেইদিন তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হলেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী আর অনেক পিছনে চললেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে। তখন আশ্বিন মাস, মহরমের দিন! টোডাশহরের মোগল-বাজারের প্রকাণ্ড চক— নিশান আর ঘোড়া আর নানাবর্ণের কাগজের তাজিয়া, দুলদুল, পাঞ্জা, লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার আর লোকে-লোকে গিসগিস করছে। স্বয়ং সুলতান জুম্মা মসজিদের ছাদে উঠে তামাশা দেখছেন, এমন সময় মস্ত একটা তাজিয়ার সঙ্গে হাসান-হোসেন করতে-করতে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে গিয়ে থামল। সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুকিয়ে দেখলেন দুজন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে! আর বেশি কিছু সুলতানকে দেখতে হল না; ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে সুলতানের

বুকের মাঝ থেকে প্রাণটি শুষে নিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল— আকাশের দিকে! টোডার সুলতান উল্টে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে। রাজপুত যারা, তারা গিয়ে পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইকে ঘিরে লড়তে লাগল— মুসলমানদের সঙ্গে। সেই অবসরে সুলতানের যত আমীর-ওমরা লুঙি ছেড়ে, দাড়ি ফেলে, বিবি আর মুরগির খাঁচা লুকিয়ে নিয়ে, রাতারাতি শহর ছেড়ে আজমীরের দিকে চম্পট দিল। সকালবেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল করে নিলেন।

পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারানার কাছে পৌঁছল। এইবার বাপের প্রাণ গলল। জয়মল নেই, সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানে না, একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বীরাজ— ছেলের মতো ছেলে, মহারানা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীর কেল্লায় দুজনকে থাকবার হুকুম দিলেন। মেবারের একেবারে শেষ সীমায় কমলমীর। এ সেই কেল্লা যেখানে লছমীরানী এতটুকু হাম্বিরকে নিয়ে বাস করতেন। কতদিন কেটে গেছে, কেল্লা শূন্য পড়েছিল; আর আজ আবার কত পুরুষ পরে পৃথ্বীরাজ-তারাবাই— বর আর বৌ— হাসি বাঁশি গান দিয়ে সেই পুরোনো কেল্লার শূন্য ঘরগুলি পূর্ণ করে দেখা দিলেন। এই বাপেতে-ছেলেতে বরেতে বধূতে মিলন আর আনন্দের দিনে একসময় চিতোরে পৃথ্বীরাজ মহারানার সভায় বসে আছেন, সভা প্রায় ভঙ্গ হয়, মহারানা উঠি উঠি করছেন— এমন সময় মালোয়া থেকে দূত এসে খবর পাঠালে, এখনি মহারানার সঙ্গে দেখা করতে চাই! একসময় ছিল, যখন চিতোরের মহারানার সঙ্গে দেখা করতে হলে দিল্লীর বাদশার দূতকেও অন্তত পনেরো দিন মহারানার সুবিধার জন্য অপেক্ষা করতে হত, কিন্তু আজ মালোয়ার দূত এসেই বুক-ফুলিয়ে, কোনো হুকুমের অপেক্ষা না রেখে মহারানার দরবারে ঢুকল। শুধু

তাই নয়, লোকটা একেবারে মহারানার গা-ঘেঁষে বসে যেন সমানে-সমানে কথাবার্তা শুরু করে দিলে। দূতের এই আস্পর্ধা দেখে পৃথ্বীরাজ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। খুব খানিক বাজে বকে দূত বিদায় হবার পর পৃথ্বীরাজ ঐ মালোয়ার দূতকে এত ভয় আর খাতির করবার কারণটা মহারানাকে শুধোলেন। বুড়ো রানা পৃথ্বীরাজের পিঠে হাত বুলিয়ে জবাব দিলেন, বুঝলে না, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই দন্তহীন সিংহের মতো গাদাও আমাকে লাথি মারতে চাচ্ছে। তোমরা নিজেদের মধ্যেই ভায়ে-ভায়ে লড়তে ব্যস্ত রয়েছ, তাই আমাকে সবদিক ঠাণ্ডা রেখে খুশি রেখে কোনো রকমে শান্তিতে নিজের আর প্রজাদের জমিজমা জরু-গরু সামলে চলতে হচ্ছে— আজ ক'বছর ধরে।' পৃথ্বীরাজ বাপের কথার কোনো জবাব দিলেন না কিন্তু বাপের কত যে দুঃখ, তা বুঝতে আজ তাঁর দেরি হল না। তিনি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে সভা থেকে বেরিয়ে একেবারে নিজের দলবল নিয়ে সোজা মালোয়া রাজার রাজ্যে গিয়ে হাঁক দিলেন 'যুদ্ধং দেহি!'

দুই দলে লড়াই বাধল। মাঠের মাঝে দুই দলের তাঁবু পড়েছে। যুদ্ধের আগের রাতে মালোয়ারাজ নিজের শিবিরে মখমলের গদিতে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে মহা ধুমধামে নাচ দেখছেন, এমন সময় ঝড়ের মতো পৃথ্বীরাজ এসে রাজাকে একেবারে ধরাধরি করে তুলে নিলে নিজের কোটে এনে বন্ধ করলেন। মজলিস ভেঙ্গে গেল— ঝাড়লণ্ঠনগুলোর সঙ্গে চুরমার হয়ে! নাচনী, গাইয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল— পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত সাহস দেখে।

রাজার সেনাপতি তাড়াতাড়ি সৈন্য সাজাচ্ছেন এমন সময় পৃথ্বীরাজ মালোয়ারাজেরই লিখন সেনাপতির কাছে গিয়ে পাঠালেন, 'আমি চিতোর চললেম

বন্দী হয়ে। কিন্তু খবরদার আমাকে ছাড়বার চেষ্টাও কোনো না। তাহলেই আমার প্রাণ যাবে, এখনি এসে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো, যুদ্ধ বন্ধ করে দাও।'

রাজা-রাজড়ার কথা— সেনাপতি সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে শুকনো-মুখে একা পৃথ্বীরাজের শিবিরে হাজির হলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'রাজার প্রাণের জন্যে কোনো ভয় নেই; আমি ওঁকে চিতোরে নিয়ে যাচ্ছি, খুব যত্নেই রাখব আর সুস্থ শরীরেই ফিরিয়ে দেব; তোমাদের রাজার সেই হামবড়া দূতটাকেও ফিরে পাবে। মহারানা দূতকেও চান না, বন্দীকেও নয়, কেবল মালোয়ার কাছ থেকে যে নমস্কারটা তাঁর প্রাপ্য তাই তিনি আমাকে আনতে হুকুম দিয়েছেন। তাই তোমাদের রাজার একবার সশরীরে চিতোর যাওয়া দরকার। কিন্তু এখান থেকে কিংবা পথের থেকে যদি রাজাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করো, তবে ওঁর ধড়টিই শুধু ফিরে পাবে, মাথাটি গিয়ে পড়ে থাকবে চিতোরের মহারানার সিংহাসনের নিচেই— পা রাখবার পিঁড়িখানির ঠিক সামনেই!'

মহারানা সভায় বসে আছেন, পৃথ্বীরাজ মালোয়াকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে উপস্থিত। সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল! সেই সময় একজন পৃথ্বীরাজের চর দূতের ঘাড় ধরে এনে বললে, 'শিখে নাও মহারানার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়— তোমার নিজের দেশের রাজার কাছে।' দূত থরহরি কাঁপতে লাগল; তার কপাল বেয়ে কালঘাম ছুটল। মহারানা ব্যাপার বুঝে খুব খাতির করে মালোয়াকে নিজের কাছে বসালেন, তারপর কিছুদিন চিতোরে আরামে থাকার পর মালোয়ার রাজা আর রাজদূত দুজনেই ছুটি পেয়ে দেশে গেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রানার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল দুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। পৃথ্বীরাজ তখন অনেক দূরে— কমলমীরে,

সওয়ার খবর নিয়ে সেদিকে ছুটল— মহারানা দলবল নিয়ে চটপট লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন। সদ্‌রী, বাটেরা, নায়ি আর নিমচ; এর মধ্যে যত পরগণা সমস্ত দখল করে চিতোরের খুব কাছে গাভিরী-নদীর ওপারে সুরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে। সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধল। রানার ফৌজ ক্রমেই হঠতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারানা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সুরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল করেছে, বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেইদিনের মতো স্থগিত রইল। দুই দলের লড়াই বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছে, মাঠের দিকে-দিকে মশাল আর ধুনি জ্বলছে, সারাদিনের পর সুরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘাগুলো ধুয়ে-পুঁছে পার্টি-বেঁধে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, এমন সময় হঠাৎ সামনে পৃথ্বীরাজকে দেখে সুরজমল খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের পার্টিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধরে খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বললেন, ‘ভয় নেই, কেমন আছ তাই জানতে এলেম।’ সুরজমল একটু হেসে বললেন, ‘হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম! যা হোক অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে খুশি হলেম। মহারানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করোনি?’ পৃথ্বীরাজও হেসে বললেন, ‘কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।’ এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির হল। সুরজমল বললেন, আরে দেখচিসনে কে এসেছে। যা দৌড়ে আর এক থালা নিয়ে আয়।’ দাসী একদিক-ওদিক চাইতে দেখে সুরজমল বললেন, ‘বুঝেছি সারংদেব এই একথালা বই আর

কিছু পাঠায়নি; খুড়োভাইপোতে আজ এক থালেই খাব।’ শুনেই পৃথ্বীরাজ একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিলেন। দিনের বেলার শত্রুতা গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার চোটে কোথায় পালিয়ে গেল! বিদায়ের সময় পৃথ্বীরাজ খুড়োকে বললেন, ‘আমাদের পুরোনো ঝগড়াটা তাহলে আজ তোলা থাক, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কী বলো?’ সুরজমল হেসে বললেন, ‘বেশ, আজকের মতো একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্! কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরি থাকব জেনো।’

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন। পৃথ্বীরাজও তাঁদের পিছনে তাড়িয়ে চললেন— একটার পরে একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে-করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না। সারংদেবের রাজ্যটা পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ দখল করে নিলেন! দুই বিদ্রোহী তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে নিমচের জঙ্গলে বড়ো-বড়ো গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা দিয়ে খুব মজবুত-রকম বরোজ বানিয়ে মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। একদিন সুরজমল নিশ্চিন্ত মনে বসে গল্পগুজব করছেন— দুপুরবেলা বাইরে বনের মধ্যেটা শন্‌শান, কোনখানে ঘনপাতার আড়ালে বসে দুটো নীল পায়রা কেবলি বকম-বকম করছে— এমন সময় বাঘ যেমন চুপিসাড়ে এসে হঠাৎ শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি পৃথ্বীরাজ ঘরের বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে সুরজমলকে চেপে ধরলেন। দুজনে ধস্তাধস্তি চলল। পৃথ্বীরাজ খুড়োকে কাবু করেছেন, এমন সময় সারংদেব দুজনের মাঝে পড়ে পৃথ্বীরাজকে ঠাণ্ডা করে বললেন, ‘কারো কী! দেখছ না তোমার খুড়োর অবস্থা? কী রকম কাহিল, এক চড়ে উল্‌টে পড়েন! দাও, ছেড়ে দাও বেচারাকে!’ সারংদেবের মোড়লি সুরজমলের মোটেই ভালো লাগল না, তিনি বুক ফুলিয়ে

বললেন, 'দেখো সারংদেব, যে চাপড়টার কথা বললেন সে চাপড়টা এখন আমার এই ভাইপোর হাত থেকে এলে আমি কাবু হব বটে কিন্তু তোমাদের কারু হাত থেকে এলে এই কাহিল শরীরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, আর এক চাপড়ের বদলে তোমার নাকে দশটা ঘুঁসি বসিয়ে দেবে নিশ্চয়ই। সরে দাঁড়াও, লড়তে হয় আমরা খুড়ো-ভাইপোতে লড়ব; মিটমাট করতে হয় তো আমরাই করব— বুঝেচ?' সুরজমলের তেজ দেখে পৃথ্বীরাজ অবাক হলেন, সারংদেব রেগে কটমট করে চাইতে-চাইতে বেরিয়ে গেলেন; ঝনাৎ করে সুরজমল নিজের তলোয়ার খাপে বন্ধ করে বললেন, 'দেখো পৃথ্বীরাজ, তোমাতে আমাতে লড়াই— এতে আমি যদি মরি তোমার হাতে, তাতে কোনো দুঃখও নেই, ক্ষতিও নেই— ছেলে দুটো আমার উপযুক্ত হয়েছে, কিছু না জোটে তো মহারানার ফৌজে গিয়ে ভর্তি হবে, তবু তোমাদের বিরুদ্ধে আমার মতো তারা অস্ত্র ধরবে না। কিন্তু তুমি যদি আমার হাতে মরো তবে শুধু যে আমার লজ্জার উপর লজ্জা, দুঃখের উপর দুঃখ পেতে হবে, তা নয়; দাদার পরে তুমি না থাকলে চিতোরের দশাটা কী হবে ভেবেছ কি? আমি লড়ব না। ইচ্ছা হয় তুমি আমাকে মেরে ফেলো, কিন্তু বন্দী করে যে আমায় নিয়ে যাবে তা হবে না।' সুরজমল যে চিতোরের সঙ্গে প্রাণে-প্রাণে এক, তা বুঝতে পৃথ্বীরাজের দেরি হল না। তলোয়ার বন্ধ করে তিনি খুড়োকে প্রণাম করলেন। সুরজমল ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এতদিনে আমার অদৃষ্টের লিখন একটু ফলল— তোমার হৃদয়সিংহাসনের খুব কাছে আমি এলেম; এখন বাকি শুধু যে মাটিতে জন্মেছি সেই মাটির এক টুকরোতে মাথা রেখে মরার ব্যবস্থা করে নেয়া।' পৃথ্বীরাজ খুড়োর পাশে বসে সেই আগেকার মতো আবার হাসিমুখে শুধোলেন, 'আমি আসবার আগে তুমি কী করছিলে খুড়ো?' 'ছেলেদের

রাজস্থানের ইতিহাস আর গল্প শুনিয়ে খানিক বাজে সময় কাটাচ্ছিলেম'— বলে খুড়ো হাসলেন।

পৃথ্বীরাজ অবাক হয়ে বললেন, 'আমি তাড়া করে আসতে পারি জেনেও সেজন্য সতর্ক না থেকে বেশ আরামে শুয়ে গল্প করছিলে?'

সুরজমল হেসে বললেন, 'লড়াই করা কি পালানো— এ দুটোই করবার পথ তুমি বন্ধ করেছ, কাজেই ছেলেদের নিয়ে খোশগল্প করে সময় কাটানো ছাড়া করবার আর কী আছে বলো?

পৃথ্বীরাজ শুনে বললেন, 'কেন, আমার সঙ্গে বাবার কাছে গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাটা করে নেবার চেষ্টা করো না কেন!'

সুরজমল খানিক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আগে হলে যেতেন কিন্তু এই বিদ্রোহের পরে মাথা-গোঁজবার জায়গা চিতোরের বাইরে করে নেওয়াই ঠিক; আর তা হলেই ধড় এবং মাথা— দুটো নিয়ে কিছুদিন আরাম করা যেতে পারবে।' পৃথ্বীরাজ খানিক ভেবে বললেন, 'তা যেন হল, কিন্তু মহারানাকে একটা মাথা না হাজির করে দিতে পারলে আমার যে মাথা হেঁট হবে, কাটাও যাবে— তার কী বল!'

সুরজমল পৃথ্বীরাজের কানে-কানে বললেন, 'সারংদেবের মাথাটা যদি কাজে লাগে তো নিয়ে যাও; ওর মাথার সঙ্গে ওর রাজ্যটাও হাতে আসবে, আমার মাথার সঙ্গে এই ছেঁড়া পাগড়িটা ছাড়া আর তো কিছুই পাচ্ছ না! বেশি সুখ্যাতি পাবে ওই মাথাটা নিলে।'

পৃথ্বীরাজ প্রস্তুত হয়ে উঠলেন, কিন্তু বরোজের মধ্যে সারংদেবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি চোখ-রাঙিয়ে খুড়োকে বললেন, 'আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ?'

সুরজমল খানিক ভেবে বললেন, 'এস আমার সঙ্গে বাইরে, বড়ো মাথা না পাও, ছোটো মাথাই নিও।' বনের মধ্যে খানিক এগিয়ে গিয়ে সুরজমল একটা ভাঙা মন্দির দেখিয়ে বললে, 'দেখেছ মন্দিরটা, এখানে এক সময় নরবলি হত! বহুদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে; দেবীও মানুষের কাঁচা মাথা অনেককাল পুজো পাননি, ওইখানে সারংদেব আমাকে পুজো করতে যেতে আজ ডেকে গেছে, কিন্তু আমার হয়ে ওখানে যেতে তোমার সাহস হবে কি?'

'খুব হবে!'— বলেই পৃথ্বীরাজ সুরজমলকে নিজের পাগড়ি দিয়ে কষে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে মন্দিরে ঢুকলেন। বেশি দেরি হল না, সারংদেবের কাঁচা মাথাটা কেটে নিয়ে খুড়োর বাঁধন খুলে দিয়ে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ বন্ধ করে চিতোরে চলে গেলেন। যে-সব পরগণা জয় করতে-করতে সুরজমল ফৌজের পায়ের তলায় প্রজার সুখ শান্তি চূর্ণ করে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন সেই নায়ি, বাটেরা, নিমচের রাস্তা ধরেই হেরে ফিরতে হল— তাঁকে ঘাড় হেঁট করে। তিনটে বড়ো-বড়ো রাজত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল, রইল কেবল একটুখানি সদ্রিপরগণা! কিন্তু সেটুকুও বেশিদিন থাকবে কি না সুরজমল ভাবছেন— এমন সময়ে একদিন দেখলেন গাঁয়ের ধারে মন্দিরের সামনে একটি ডালকুত্তো ছোটো একটি ছাগলছানা শিকার করবার চেষ্টা করতেই একটা রামছাগল তাকে ঢুঁ মেরে তাড়িয়ে ছানাটাসুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে সেঁধাল। কুকুরটা মন্দিরের সামনে ঘেউঘেউ করে চেঁচাতে লাগল— কিন্তু ভিতরে ঢোকবার সাহস করলে না।

সুরজমল ঠিক করলেন, এইখানেই নিরাপদে থাকা যাবে— এই মন্দির হবে আমার ঘর, কেল্লা, সমস্তই। সেইদিন সুরজমল সদ্রি থেকে কারিগর ডাকিয়ে সেই মন্দির ঘিরে ছোটো এক কেল্লা তুললেন, তারা চারিদিকে বাজার হাট বসালেন; সব শেষ 'দেওলা' গ্রাম মায় সমস্ত সদ্রিপরগণা আর কন্থল পাহাড়ের উপর তাঁর কেল্লাটি পর্যন্ত দেবতার নামে উৎসর্গ করে সমস্তটার নাম রাখলেন দেউলগড়। দেবতার কেল্লা তার উপর চড়াও হতে রানারও সাধ্য নেই, ষাট হাজার বছর নরকের ভয় আছে! সব রাজার রাজ্যের সীমানার বাইরে এই দেউলগড়ে, সুরজমল নির্ভয়ে রইলেন, নিশ্চন্ত হয়ে মরবার সময় পেলেন; তাঁর কপালের লিখন এমনি করে ফলল।

জয়মল, সুরজমল, দুইজনেই চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে সরে পড়লেন; রইলেন কেবল সঙ্গ। একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে— সঙ্গ বেঁচে আছেন; শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে। পৃথ্বীরাজ তখনি নিজের দলবল নিয়ে সঙ্গকে জালে বাঁধার পরামর্শ করতে বসলেন; কিন্তু পৃথ্বীরাজের অদৃষ্টও বসে ছিল না, সে দিনে-রাতে আলোতে-অন্ধকারে সুখে-দুঃখে মিলিয়ে যে বেড়াজাল পৃথ্বীরাজকে ধরবার জন্য বুনে চলেছিল, এতদিনে সেটা শেষ হল। সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুজে সঙ্গকে ধরবার জন্যে বার হবেন, এমন সময় শিরোহী থেকে পৃথ্বীরাজের ছোটোবোন এক পত্র পাঠালেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী। বিয়ে হয়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান করছে, লাথি মারছে, ঘরের বার করে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং একেবারে নির্দয়। বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না দিলে তাঁর ছোটোবোন মারা যাবে। ছোটোবোনের কান্না ভরা সেই

চিঠি পড়ে, পৃথ্বীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরে, বাইরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে— কিন্তু যাওয়া হলো না, পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহীর মুখে— বোনকে রক্ষা করতে। অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চলল পৃথ্বীরাজকে সঙ্গের দিকে থেকে ঠিক উল্টো মুখে— অনেক দূরে!

রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় পড়ে রানার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলছেন, রানার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহীর রাজা ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাথিতে শিরোহীর রাজাটাকে ভূঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন। রানার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধরলেন, 'দাদা থামো, প্রাণে মেরো না।'

পৃথ্বীরাজ রেগে বললেন, 'এত বড়ো ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে। জানে না তুই মহারানার মেয়ে। ওকে কুকুরের মতো চাবুক মেরে সিধে করতে হয়।'

শিরোহীর তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথ্বীরাজের পা জড়িয়ে বললে, 'এমন কাজ আর হবে না, ক্ষমা করো।'

পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় দরে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'নে, আমার বোনের জুতোজোড়া মাথায় করে ওর কাছে ক্ষমা চা— তবে রক্ষে পাবি।'

'একথা আগে বললেই হত', বলে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় রেখে রানী বললেন, 'থাক এবার এই পর্যন্ত। যাও এখন দাদাকে জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করোগে, আমায় একটু ঘুমুতে দাও।'

রানার জামাই খুব খাতির করে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহীর খাসা নাড়ু– গুটিকতক জল খেতে দিলেন। শিরোহীর খাসা-

নাড়ু— অমন নাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁর পৌঁছতে হল না; শিরোহীর মতিচুর সেঁকোবিষ আর হীরেচুয়ে মেখে তাঁর ভগ্নিপতি খেতে দিয়েছিল— জুতো-তোলার শোধ নিতে!

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন— রাস্তার ধুলোয়। কমলমীর— যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল— দূরে— দূরে— কতদূরে সকালের আগুনবরণ আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে। আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবৎ-খানায় বসে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে— ‘ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।’